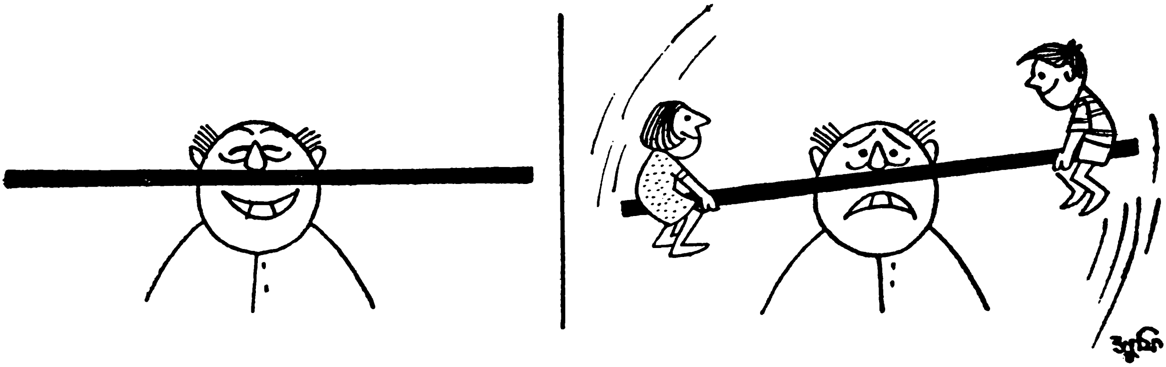

শিশু
মনস্তত্ত্ব

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন - সৌরভ দে

স্ক্যান ও এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

optifmcybertron@gmail.com

dhulokhela@gmail.com

সন্দেশ

নবম বর্ষ—দ্বাদশ সংখ্যা

চৈত্র ১৩৭৬/ এপ্রিল ১৯৭০

এমন যদি হয়

করুণাময় বসু

চিকন সোনা ময়ূরকণ্ঠী মেঘে
হালকা রোদের একটু ছোঁয়ায় স্বপ্ন আছে লেগে :
ঘুমভরা এই মিষ্টি দিনের দুপুর বেলার আলো
ছোট্ট ছেলে পুপুর চোখে লাগছে বড়ো ভালো।
ফুল বাগানের একটি কোণে বসে
বিনিসুতোর মায়ায় বোনা স্বপ্নখানি উড়িয়ে দিয়ে ভাবছে একা ও সে ;—

এমন যদি হয়,
প্রজাপতির পাখার নাচন নীল আকাশে নয়,
দোতলার ওই শোবার ঘরে একটা আছে কাঁচের রঙিন শিশি,
আমের আচার পাঠিয়েছিল অনেক দূরের ফয়জাবাদের পিসি।
রাখবে ধরে ফুলবাগানের প্রজাপতি ওই শিশিতে পুরে,
ঝিলমিলিয়ে রঙীন ডানা নাচবে ঘুরে ঘুরে।

এমন যদি হয়,
পাখির গানে গাছের পাতা, বনের ছায়া ভরবে, সে তো নয় ঃ
আনবে ডেকে সবুজ টিয়ে, হলুদ পাখি, বুলবুলিদের মাঠের ধারে গিয়ে,
আদর করে রাখবে তাদের খাঁচার ভিতর নিয়ে।
খাঁচার ভিতর গাইবে তারা আপন মনে গান,—
সেই সুরেতে রোদের খুসি ছড়িয়ে যাবে, বাতাস হয়ে দুলিয়ে দেবে
ছলছলিয়ে মাঠের কচি ধান।
রাতের বেলা জ্যোৎস্না হয়ে, স্বপ্ন হয়ে মিষ্টি গানের সুরে
ঘুমের ভিতর পুপুর কানে চম্পাবতীর রূপকথাটি বাজবে ঘুরে ঘুরে।

শীতের দিনে শম্ভুকাকা সুদূর বনে গেলে,
বলবে তারে আনতে হবে একটা ছোট হরিণ ছানা পেলে,
রাখবে তারে ঝিলের ধারে, সাঁকোর কাছে, কচি ঘাসের পাশে,
ভালোবাসায় ভুলিয়ে দেবে মনের ব্যথা, মায়ের কথা, বনের কথা,
মনেই নাহি আসে

রাতের বেলা বাবার কাছে এসব কথা বললে পুপু হেসে।
বললে বাবা একটু ভেবে, অল্প একটু কেশে,
আচ্ছা, এমন যদি হয়,
সোনার খাঁচা গড়িয়ে দিলাম, তার ভিতরে ছোট্ট পুপু রয় ঃ
হেসে নেচে কাটিয়ে দেবে বেলা,
খাঁচার ভিতর আপন মনে সঙ্গীবিহীন খেলা।
বাবা, মা কেউ থাকবে না তার কাছে,
সন্ধ্যে বেলা অন্ধকারে দৈত্যছানা দুলবে তারা দোলন চাঁপা গাছে।

ওরে ব্বা-বা উঠল কেঁদে ছোট্ট পুপু ঃ কক্ষণো তা নয়।
একটু হেসে বললে বাবা, তবে?
উড়িয়ে দেব নীল আকাশে প্রজাপতি, বনের পাখি, বনের হরিণ
বনেই ছাড়া রবে।

ঐতিহাসিক গল্প

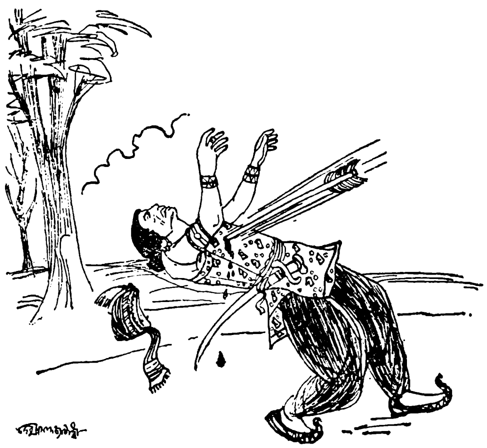

ভাঙ্গাগড়া

নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়

ওরা তিন ভাই। তিন রাজপুত্র।

পিতার মৃত্যুর পর শত্রুশক্তির চক্রান্তে তারা আর সিংহাসনে বসতে পেল না। তাই পশ্চিমদেশ থেকে তারা পালিয়েই এল আমাদের দেশে। কোথায় জান? বীরভূম অঞ্চলে।

ওখানে তখন বন আর বন। কিছু কিছু আদিবাসীদের বাস। সেই আদিবাসীদের সঙ্গেও অল্প বিস্তর লড়তে হয়েছিল এই তিন রাজপুত্রকে। কারণ আদিবাসীরাও চায় না যে, কোন বিদেশী শক্তি এসে তাদের ওপর প্রভুত্ব করুক।

কিন্তু না চাইলে কি হবে? আদিবাসীদের হার হল। তিন রাজপুত্রের সঙ্গে কোন রকমেই এঁটে উঠতে পারল না তারা।

এই তিন রাজপুত্রের নাম বীরসিংহ, চৈতন্যসিংহ এবং ফতেসিংহ।

এই বীরভূম অঞ্চলেই ক্রমে ওরা তিন ভাই তিনটি পৃথক রাজ্য স্থাপন করলেন। সৈন্য-সামন্ত, পাইক-কোতয়াল সবই হল। বড়ভাই বীরসিংহ নিজের নামানুসারে তাঁর রাজধানীর নাম রাখলেন বীরসিংহপুর।

বীরসিংহ কিন্তু খুব বীর ছিলেন। শোনা যায় তিনি এত বীর ছিলেন যে, স্নানের সময় একমুঠো সরষে নিয়ে দু'হাতে পিষে তা থেকে তেল বের করে গায়ে মাখতেন আর প্রত্যেকদিন বীরসিংহপুর থেকে ঘোড়ায় চড়ে কাটোয়ায় এসে গঙ্গাস্নান করে যেতেন।

ক্রমে তাঁর শক্তির কথা সারা দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। বাংলার সুবাদার ছিলেন তখন গিয়াসউদ্দিন। তিনি বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

তখন ১২২৬ খ্রীষ্টাব্দ।

গিয়াসউদ্দিন বীরসিংহপুর আক্রমণ করলেন।

তুমুল যুদ্ধ হল।

খবর পেয়ে চৈতন্যসিংহ ও ফতেসিংহ সসৈন্যে ছুটে এলেন বীরসিংহপুর রক্ষা করতে। তিনভাই একসঙ্গে গিয়াসউদ্দিনের বিরুদ্ধে লড়তে লাগলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই গিয়াসৃউদ্দিন পরাজিত হলেন ও পালিয়ে গেলেন।

এই পরাজয়ের অপমান গিয়াসউদ্দিনকে আরও ক্রুদ্ধ করে তুলল। যেমন করেই হোক বীরসিংহপুর দখল করতেই হবে। তার জন্যে চাই আবার আক্রমণ। না, তাতেও হয়ত ফল হবে না। ওরা যে তিন ভাই! ওদের তিন ভাইএর সঙ্গে যুদ্ধ করা খুব সহজ কথা নয়।

অনেক ভাবতে লাগলেন গিয়াসৃউদ্দিন। অবশেষে তিনি চতুরতার আশ্রয় নিলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন যে, ওদের তিন ভাইএর মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি করতে না পারলে কিছুতেই ওদের যুদ্ধে হারানো যাবে না। যখন ওরা একে অন্যের বিপদে এগিয়ে আসবে না তখনই ওদের পরাস্ত করা যাবে।

করলেনও ঠিক তাই। কূটবুদ্ধির আশ্রয় নিয়ে গিয়াসউদ্দিন তিন ভাইএর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করলেন। তাঁরা পরস্পরকে শত্রু ভাবতে লাগলেন।

ঠিক তখনই সুযোগ বুঝে একদিন গভীর রাত্রে গিয়াসউদ্দিন সৈন্যদলের আগে আগে একদল গরু নিয়ে বীরসিংহপুর আক্রমণ করলেন।

বুদ্ধিটা কিন্তু ছোটভাই ফতেসিংহেরই দেওয়া। তিনি জানতেন যে, তাঁর দাদা বীরসিংহ গরুকে ভগবতী জ্ঞানে ভক্তি করেন। সুতরাং গরু দেখলেই তিনি নিশ্চয়ই আর অস্ত্রধারণ করবেন না।

এমন বুদ্ধিতে গিয়াসউদ্দিন কেন, যে কেউই বীরসিংহকে পরাস্ত করতে পারত।

যুদ্ধ আর হল না।

সৈন্যের আগে আগে একদল গরু আসতে দেখে বীরসিংহ নিজের সৈন্যদলকে বললেন, তোমরা কেউ অস্ত্র ধর না! যে যেদিকে পার চলে গিয়ে নিজেদের প্রাণ বাঁচাও!

এদিকে শত্রুসৈন্যও দ্রুত এগিয়ে এল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা বিষাক্ত তীর বীরসিংহের বুকে এসে বিঁধল। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

মাটিতে লুটিয়ে পড়েও বীরসিংহ অস্ফুটস্বরে বললেন, গিয়াসউদ্দিন! এই মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্যেও তোমার চতুরতার প্রশংসা না করে পারছি না। তুমি আমাদের তিন ভাইএর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ। নইলে তোমার সাধ্য কি যে, বীরসিংহপুরের মাটিতে পা রাখ?

মরীচিকা

অজেয় রায়

(মাস্টার মশাই, বা প্রত্নতাত্ত্বিক রতনলাল রায় ফরাসী প্রাণিবিজ্ঞানী অঁদ্রে ফুশের সঙ্গে গোবি মরুভূমিতে ক্যাম্প ফেলে লুপ্ত সভ্যতা ও প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর অনুসন্ধান করছিলেন। একদিন দূর থেকে তিনি বালির উপর এক লামাকে পড়ে থাকতে দেখলেন—তাঁকে ক্যাম্পে নিয়ে এসে সেবাশুশ্রূষা করে সুস্থ করে তুললেন। কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ লামা চিমপে তাঁকে দিতে চাইলেন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের স্বহস্তে লেখা এক বহুমূল্য পুঁথির অংশ, যার সংবাদ কারো জানা নেই। এদিকে রাঁধুনী লিকে নিয়ে বড় অশান্তি, সকলের কাছে সে ধার করেছে, শোধ দেবার নাম নেই। অপর দিকে তানচুংএর লোলুপ দৃষ্টি প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য জিনিসের দিকে।)

॥ ৩ ॥

পরদিন ভোরবেলা।

—ভোর ঠিক পাঁচটার সময় আমরা এককাপ কফি খাই।

এলার্মের শব্দে আমাদের ঘুম ভেঙ্গে গেল। পাঁচটা বাজতে দশ। এখুনি কফি নিয়ে ঢুকবে লি।

আমার চোখে তখনও তন্দ্রা। চোখ বুজে কফির প্রতীক্ষা করতে থাকি—

ফুশে বলল ব্যাপার কি রয়? পাঁচটা বেজে দশ মিনিট হল। এখনও লির দেখা নেই কেন?

সত্যিতো। লির কোন দিন দেরি হয়না।

—নিশ্চয় রাত জেগেছিল। এখন ঘুমচ্ছে। দাঁড়াও ডাকি।

—ফুশে তাঁবু থেকে বেরল।

মিনিট পনেরোর মধ্যে ফুশে ফিরে এল। তার চোখে মুখে উদ্বেগ।—রয় লি নেই। কোথাও দেখতে পেলাম না তাকে।

—তার মানে? আমি বিছানায় উঠে বসি। গেল কোথায়?

—জানিনা। উনুনে আগুন পড়েনি। জল ফুটছে না। তাছাড়া ওর টেন্টে দেখেছি। সেখানেও নেই।

অন্যদের জিজ্ঞেস করলাম—কেউ দেখেনি লিকে। অল্পক্ষণের জন্যে কোথাও গেলে উনুনে আগুন দিয়ে যাবে না? কি রকম রহস্যময় লাগছে যেন ব্যাপারটা।

—চলতো দেখি। আমিও লিয়ের ত'াবুতে গেলাম।

—ঠিকই বলেছে ফুশে। কোন চিহ্ন নেই লোকটার শ্রেফ উধাও।

তাহাই খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে কয়েকটা ব্যাপার নজরে পড়ল—লির বিছানা পরিপাটি। নিভাঁজ। মনে হয় রাতে ব্যবহার করা হয় নি। কতগুলো চেনা জিনিস নেই—যেমন তার মস্ত রঙ চঙা ঝুলিটা। তার মরুভূমিতে চলার মোটা উলের জুতো। আরও কিছু টুকিটাকি জিনিস নেই বলে মনে হল।

—পালাল নাকি?

—কিন্তু খাম্‌কা পালাতে যাবে কেন?

—তবে কি নেকড়েতে টেনে নিয়ে গেছে? কিন্তু লি বাচ্চা ছেলে নয়। নেকড়ের পাল আক্রমণ করলে চেঁচাতো নিশ্চয়ই। তার জুতো থলি এসবই বা গেল কোথায়?

—কে তাকে শেষ দেখেছে? প্রহরী?

প্রত্যেক দিন রাতে পালা করে পাহারার ব্যবস্থা আছে। সে রাতের পাহারাদার জানাল—রাত তিনটের সময় সে লিকে দেখেছে। তাঁবুর বাইরে বসে লি নাকি পাইপ টানছিল। তাকে বলে—হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। তাই এক রাউণ্ড পাইপ খেয়ে নিচ্ছি।

—তারপর?

প্রহরী আমতা আমতা করে। বোঝা গেল রাত্র তিনটের পর সে পাহারাদারীতে ক্ষান্ত দিয়ে নিদ্রা গিয়েছিল।

—হঠাৎ আমার মনে এল লামার কথা। সে খুব ভোরে ওঠে। পায়ের ঘা সেরে যাওয়ার পর থেকে তাকে দেখেছি কাকভোরে উঠে তাঁবুর বাইরে দাঁড়িয়ে পুবমুখো চেয়ে থাকে। সূর্যোদয় দেখে। লিকে হয়তো সে দেখে থাকবে।

লামার তাঁবুতে উ'কি মেরেই আমাদের চক্ষু ছানাবড়া।

লামা বন্দী। খাটের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে। তার মুখ কাপড় দিয়ে বাঁধা। চার হাত-পাও বাঁধা, খাটের গায়ে শক্ত করে। বেচারা কাতর চোখে চেয়ে আছে।

মেঝেতে লামার ঝুলিটা পড়ে। ভিতরের জিনিস-পত্র ইতস্তত: ছড়ানো। তার গায়ের আলখাল্লার বোতাম খোলা।

তাড়াতাড়ি লামাকে মুক্ত করি।

লিয়ের কীর্তি !!

শুনলাম, শেষরাতে লি গোপনে তার তাঁবুতে ঢোকে। জিনিস হাতড়াতে থাকে। লামা জেগে ওঠামাত্র তার মুখ বেঁধে ফেলে। ক্ষীণ দুর্বল লামা লির মতো দুষমন জোয়ানের সঙ্গে পেরে উঠবে কেন?

লি জিজ্ঞাসা করে পুঁথি কোথায়? উত্তর না পেয়ে তার পোশাক খুঁজে বাক্সটা বের করে নেয়।

দেখা গেল, পুঁথির বাক্স ছাড়া লি অন্য কিছুই নেয় নি। আর পাবেই বা কি লামার কাছে?

লামার মুখ দেখে কষ্ট হচ্ছিল। পুঁথি হারাবার শোকে সে তখন মুহ্যমান।

তুমুল হট্টগোল লেগে গেল।

দলের সবাই উচ্চৈস্বরে পরামর্শ দিচ্ছে নানারূপ কটুবাক্য নিক্ষেপ করছে লির উদ্দেশ্যে। হতভাগাটা যে শুধু পুঁথি নিয়ে পালিয়েছে তা নয়—তাদের ধার শোধ না করে ভেগেছে। রাগে সবাই তেলে বেগুনে জলতে থাকে।

তানচুং কপাল চাপড়ে বলল—আমারই দোষ। আমি একটি গর্দভ। কেন কাল ওর সামনে পুঁথির কথা বলতে গেলাম। পুঁথির দাম নিয়ে আলোচনা করলাম। শুনেছি দেনায় লোকটার চুল সব বিকিয়ে আছে।—দেশে ধার, প্রত্যেক মরুদ্যানের সরাইখানায় ধার। এখানে সঙ্গীদের কাছে ধার। অবস্থা অতি শোচনীয় নেশা আর জুয়ায় লোকটা ডুবেছে। আজ দু'বছর বাড়ি যায়নি। শূন্যহাতে বউ-বাচ্চাদের কাছে মুখ দেখাবে কোন্ লজ্জায়। কাজেই এমন সুযোগ হাতছাড়া করবার লোভ সামলানো ওর পক্ষে মুস্কিল। টাকার জন্য ওরা মরিয়া হয়ে উঠেছে।

আর একটা খবর জানা গেল—লির দোস্ত চ্যাংয়ের কাছে।

গত রাতে লি নাকি চ্যাংকে বলে—সে শিগগিরি অনেক টাকা পাচ্ছে। এবার সে মরুভূমির কাজ ছেড়ে দেবে। দেশে গিয়ে ব্যবসা করবে।

নেশার ঘোরে যাতা বকছে ভেবে চ্যাং দোস্তের কথায় কান দেয় নি। শুধু রসিকতা করে বলেছিল—

বড়লোক হলে আমার টাকাটা ভাই শোধ করে দিও কিন্তু।

লি বলেছিল—জরুর দেগা। কত সুদ চাই?

বড়লোক হবার সহজ পন্থাটা কি সে এঁচে রেখেছিল এখন বোঝা গেল।

ফুশে হঠাৎ বলল—রয় আমরা ওকে ফলো করব। এক্ষুনি বেরতে হবে। এ দেশে থানা পুলিশ করার কোন উপায় নেই। যা করার নিজেদেরই করতে হবে। তানচুং তুমি তিনটে সবচেয়ে দ্রুতগামী উট সাজাও। আর ইব্রাহিম খাঁ তুমি আমার সঙ্গে হেঁটে এস—পথ বাতলাবে। আমি, রয়, চুং, ইব্রাহিম এবং চিয়াং—ব্যস্ এই পাঁচজন যাব।

চিয়াং একজন উটচালক, খুব দ্রুত হাঁটতে পারে। ফুশে তাড়া দিল--চুং কুইক্। মাত্র দশমিনিট সময় দিচ্ছি। রেডি হয়ে নাও—

ইব্রাহিম নামকরা ট্র্যাকার। মরুভূমির পথে মানুষ বা পশুর চিহ্ন চিনে তাকে অনুসরণ করতে সে ওস্তাদ। মরুরাজ্যের প্রত্যেক পথঘাট তার মুখস্ত। ফুশে বলল—ইব্রাহিম বল, কোন পথে লি যেতে পারে? চটপট্।

ইব্রাহিম একটুক্ষণ ভাবল তারপর বলল—এই মরুদ্যান থেকে দুটো পথ বেরিয়েছে। একটা মিশেছে বাণিজ্যপথের সঙ্গে দক্ষিণ দিকে। সে পথে ও যাবে না। ও পথে ব্যবসায়ীরা সব সময় যাতায়াত করে। সবাই লিকে চেনে। সুতরাং তাদের কাছ থেকে আবার আমরা তার হদিশ জেনে যেতে পারি। অতএব ওপথ নিরাপদ নয়, তা লি জানে।

আর একটা পথ গেছে উত্তরে।

ঐ যে নিচু পাহাড়ের সারি যেখানে সাহেব হাড়গোড় খুঁজতে যান সেই পাহাড় ভেদ করে একটা গিরিপথের ভিতর দিয়ে পথটা ওপাশে গেছে। তারপর আবার মরুভূমি। মরুপথে উত্তর-পশ্চিমে অনেকটা গেলে পড়বে উঁচু পাহাড়। সারা বছর সে সব পাহাড়ের মাথায় বরফ জমে থাকে। ঐ দূর পাহাড়ের কোলে লির গ্রাম। লি খুব সম্ভব এখন গ্রামে ফিরে যাবার চেষ্টা করবে। তাই মনে হয় ও উত্তরের পথ ধরেছে। তবে সাহেব গিরিপথে পৌছবার আগেই কিন্তু ওকে ধরতে হবে। ও যদি একবার পাহাড়ে লুকোতে পারে তাহলে কিন্তু

ধরা দুঃসাধ্য ব্যাপার। লি হয়তো কিছুদিন এখন পাহাড়ের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে থাকবে। তারপর আমরা খোঁজাখুঁজি শেষ করে ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেলে, বিপদ কেটে গেছে দেখে গ্রামে ফিরবে।

—এখান থেকে সেই গিরিপথ কতদূর?

—প্রায় কুড়ি মাইল হবে।

—লির পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে?

—ধরুন প্রায় সাতঘণ্টা!

—বেশ তার আগেই ওকে ধরা চাই। ফুশে দৃঢ়স্বরে বলল। তুমি শুধু লিকে ফলো করে আমাদের ঠিক পথে নিয়ে চল। পথ ভুল করে দেরি হয়ে গেলে কিন্তু সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে।

যাবার আগে লামা হঠাৎ জেদ ধরল সেও আমাদের সঙ্গে যাবে।

কিছুতেই বোঝাতে পারি না।—বলি, আমরা প্রাণপণে ছুটব। একটু পরে রোদ উঠবে। আপনার এই শরীর, বড্ড স্ট্রেন হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি—

কিন্তু লামা নাছোড়বান্দা।

অগত্যা তাকেও উটের পিঠে তুলে নিলাম।

আরো অনেকেই আমাদের সঙ্গে যেতে চায়। বিশেষতঃ লির পাওনাদাররা। এই সুযোগে বেইমানটিকে দু'ঘা কষাতে পারলে তাদের প্রাণ জুড়োয়—ধার শোধের তো আশা নেই জানি।

ফুশে কিন্তু আর কাউকে সঙ্গে নিতে রাজি হল না।

*　*　*　*

হন্ হন্ করে এগোচ্ছি।

কোনো মুখে কোনো কথা নেই।

সকলের সামনে হেঁটে চলেছে ইব্রাহিম—গাইড। তার পিছনে হাঁটছে চিয়াং। চিয়াংয়ের পিছনে পর পর তিনটি উট। প্রথম উটের পিঠে আমি ও ফুশে। তারপরের দুটোতে চড়েছে তানচুং এবং লামা। চিয়াংয়ের হাতে প্রথম উটের লাগাম।

ইব্রাহিমের শ্যেন দৃষ্টি পথের ওপর। এপাশ ওপাশ নজর করতে করতে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে সে নিজের মনে মাথা নাড়ছে, হুঁ হা করছে।

বালির ওপর পায়ের ছাপ তাড়াতাড়ি মুছে যায়। শক্ত পাথুরে জমি আর ধুলোতে পায়ের দাগ ভাল পড়ে না। কাজেই এ পথে পায়ের চিহ্ন ধরে অনুসরণ করা খুবই কঠিন কাজ।

উটগুলোও যেন বুঝতে পেরেছে আমাদের আজ ভীষণ তাড়া। আমরা এক বিশেষ লক্ষ্য নিয়ে ছুটছি। গলা বাড়িয়ে, লম্বা লম্বা পা ফেলে উটগুলো এগোচ্ছে।

মাইলখানেক যাবার পর ইব্রাহিম হঠাৎ নিচু হয়ে পথ থেকে কি কুড়লো?

—এই দেখুন এক টুকরো কাঠ-কয়লা। নিশ্চয় লি পাইপ ধরিয়েছিল।

আরও দু'মাইল বাদে সে আবার পথের পাশে ছুটে গেল। হাত পনেরো দূরে, একটা ঢিবির গায়ে কি দেখে!

কয়েক টুকরো তরমুজের খোলা! টাটকা!

—নিশ্চয় যেতে যেতে লি খিদে মিটিয়েছে। দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল তরমুজের খোলাগুলো, কিন্তু

ইব্রাহিমের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াতে পারে নি।

—ক্রমশঃ রোদের তেজ বাড়তে থাকে।

পায়ের তলায় বালি-পাথর উত্তপ্ত হয়। এক নাগাড়ে এগিয়ে চলেছি। ক্ষণকালের জন্যও বিশ্রাম নিই নি বা চলার গতি শ্লথ হয় নি।

বেলা আটটার মধ্যেই মরুভূমি তেতে আগুন হয়ে উঠল। আশ্চর্য ক্ষমতা বটে ঐ দুই মরুবাসীর। যেন কলের মানুষ। আমরা উটের পিঠে বসে ক্লান্তি অনুভব করছি কিন্তু ওদের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। উটের সাথে সমান তালে হেঁটে চলেছে।

তিনঘণ্টার ওপর কেটে গেছে। পাহাড়ের সারি সামনে। থাকে থাকে পাথরের খাঁজ। ঝোপঝাড় স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। হঠাৎ ফুশে বলে উঠল—আরে ঐ তো লি!

—কোথায়? আমি বলি।

—ফুশে আমার হাতে দূরবীণটা দেয়।

সত্যিতো! লি প্রায় দু'মাইল দূরে একটা মস্ত পাথরের চাঁইয়ের আড়ালে ছায়ায় বসে। আমাদের দিকে পাশ ফিরে রয়েছে।

দলের সবাই দূরবীণ দিয়ে লিকে একবার দেখে নিল।

লি বোধহয় নিশ্চিন্ত ছিল। ভাবেনি সে কোন পথে গিয়েছে আমরা বুঝতে পারব। তাকে ফলো করব। তাই একটানা অনেকক্ষণ হেঁটে একটু জিরিয়ে নিচ্ছিল।

ইব্রাহিম বলল—লি যেখানটায় রয়েছে ওটা হচ্ছে রাস্তার মোড়। রাস্তাটা এরপর বাঁ দিকে বেঁকে গেছে। পাহাড়ের সমান্তরাল প্রায় চারমাইল গিয়ে গিরিপথে ঢুকেছে।

আমরা নিঃশব্দে এগোলাম। শুধু দ্রুত নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের আওয়াজ। উত্তেজনায় ধক্‌ধক্ করছে হৃৎপিণ্ড।

আমি ফুশের কানে কানে বললাম—

—ধর লি যদি সারেণ্ডার করে। ধর, যদি আর কোন ঝামেলা না বাড়িয়ে পুঁথি ফেরত দেয়, তবে কি করবে?

—তাহলেও ছাড়ছি না। এতো ভোগালো, কিঞ্চিৎ উত্তম মধ্যম ওর প্রাপ্য আছে।

আমি কিন্তু মনে মনে স্থির করলাম—যদি ভালয় ভালয় পুঁথি হাতে পাই তো মারধোরের দরকার নেই। লিকে তাড়িয়ে দেব। গরিব মানুষ, লোভে পড়ে দোষ করেছে। আচ্ছা, আগে তো হাতে আসুক পুঁথি তখন ফুশেকে বুঝিয়ে শুনিয়ে ঠাণ্ডা করা যাবে।

মাইলখানেকের ওপর এগিয়েছি, লি আমাদের দিকে মুখ ফেরাল। সঙ্গে সঙ্গে সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল—আমাদের সে দেখতে পেয়েছে।

—তারপরই দে ছুট।

ফুশে বলল—কতক্ষণ দৌড়বে বাছাধন, এই গরমে? পাহাড়ে পৌঁছবার আগেই তোমায় ঠিক ধরব।

আমরা তখন লিকে খালি চোখে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম।—সে দৌড়চ্ছে। হাঁটছে। বারবার পিছনে ফিরে আমাদের দিকে দেখছে ভীত ত্রস্ত ভাবে।

মাঝে মাঝে সে ঢিবির আড়ালে অদৃশ্য হচ্ছে।—তারপর আবার তাকে দেখতে পাচ্ছি।

ইব্রাহিম হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল—আরে ও চলল কোথায় রাস্তা ছেড়ে?

সত্যি তো। দেখলাম—পাহাড়ের সমান্তরাল রাস্তাটা ছেড়ে দিল, সোজাসুজি পাহাড়ের দিকে এগোচ্ছে। সর্ট-কাট্ করছে। ওখান থেকে সোজা পথে পাহাড় দু'মাইলের কম।

ইব্রাহিম বলল—লির বোধ হয় ভয় হয়েছে, রাস্তা বেয়ে গিরিপথে পৌঁছবার আগেই আমরা ওকে ধরে ফেলব। তাই এই মতলব। কিন্তু ও-ধারটায় তো কোনো রাস্তা নেই। উঁচু উঁচু বালিয়াড়ি, তারপরই পাহাড়ের ঢাল। সেখানে ছড়ানো রয়েছে অজস্র ছোট বড় পাথরের চাঁই। আর ঐ সব পাথরের নিচে গর্তে গর্তে ভয়ঙ্কর বিষধর বোড়া সাপের আড্ডা। মানুষ-পশু কেউ কখন ভুলেও ও জায়গা মাড়ায় না। এমনকি বুনো গাধা বা হরিণের দলও রাস্তার ডানপাশ দিয়ে চলাফেরা করে না। সবাই যমের মতো ভয় করে—

—থাক্গে সাপ। ফুশে বলল। ওকে ছাড়ছি না। ফলো কর। জোরে পা চালাও—

লিকে একবার দেখা গেল একটা উঁচু বালিয়াড়ির মাথায়। তারপর সে নেমে গেল নিচু ঢালুতে। আমাদের চোখের আড়ালে—

হঠাৎ এক তীব্র আর্তনাদ ভেসে এল! আবার একবার। আবার। কে যেন নিদারুণ আতংকে বার বার চেঁচিয়ে উঠল। শুনলাম—বাঁচাও বাঁচাও, রক্ষা কর!!

সাক্ষাৎ মৃত্যুর কবলে পড়লেই মানুষ এমন কাতর কণ্ঠে সাহায্য চায়।

লির গলা! কি ব্যাপার? আমরা স্তব্ধ হয়ে পড়ি। সাপের কামড় খেল নাকি লোকটা?

ফুশে বলল—চল চল, থেম না। টেন্টে সাপের বিষের ওষুধ আছে। হয়তো বাঁচানো যাবে।

সেই উঁচু ঢিবিটায় উঠলাম, যেখান থেকে লিকে শেষবারের মতো দেখা গিয়েছিল। জায়গাটা পুকুরের মতো—চারিধারে উঁচু পাড়, মাঝখানে ঢালু। অবশ্য জল নেই। শুকনো খট্খটে বালির পুকুর।

চারদিকে তাকালাম—কৈ? লি কৈ? গেল কোথায় লোকটা? যাদুমন্ত্র বলে অদৃশ্য হল নাকি?

আরে ওটা কি? দেখলাম, প্রায় পঞ্চাশ হাত দূরে ঢালের মাঝখানে এক টুকরো নীল চকচকে কাপড় পড়ে আছে। ওটা সবাই চিনি—লির রুমাল। শেষ যখন লিকে দেখি ঢিবির ওপর তখনও ওর মাথায় জড়ানো ছিল রুমালটা।

এক অজানা আশঙ্কায় মন ছম ছম করে উঠল। রুমাল লক্ষ্য করে উট চালালাম।

কিন্তু কয়েক পা গিয়েই উটগুলো দাঁড়িয়ে পড়ল। আর এক পাও এগোবে না। যত মারি, তাড়া দিই, কিছুতেই না। মুখ উঁচু করে কি জানি শুঁকছে—

উট অতি গোঁয়ারগোবিন্দ জীব। একবার না বললে হাঁ করায় কার সাধ্য! অতএব আমরা নামলাম।

এগোতে যাচ্ছি—দাঁড়ান।—ইব্রাহিম বাধা দিল।

তার মুখ গম্ভীর। ভ্রূ কুঞ্চিত। তারপর যা করল দেখে আমরা অবাক।

সে একটা ভারি পাথর কুড়িয়ে নিল। সেটা ছুঁড়ল রুমাল লক্ষ্য করে।

অবাক কাণ্ড। পাথরটা রুমালের কাছে বালির ওপর পড়েই অদৃশ্য হয়ে গেল। ঠিক যেমন জলে ঢিল পড়লে ডুবে যায়।

ইব্রাহিম আবার ছুঁড়ল—এক খণ্ড বড় পাথর।

সেটাও রুমালের কাছে পড়েই বালির মধ্যে টুপ্ করে ডুবে গেল।

ইব্রাহিম আমাদের সম্বোধন করে বলল—দেখছেন, চোরাবালি! চিৎকারের কারণটা বুঝলেন? লি চোরাবালিতে পড়ে ডুবে গেছে।

এত স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম যে কিছুক্ষণ কেউ কোনো কথা বলতে পারলাম না। তারপর সবাই উপলব্ধি করলাম কি ঘটেছে।

ছি ছি তীরে এসে তরী ডুবল। এত চেষ্টা, এত পরিশ্রম সব ব্যর্থ। লোকটা নিজে তো মরলই। অমন দুষ্প্রাপ্য পুঁথিটা অবধি টেনে নিয়ে গেল চোরাবালির অতলে। রাগে দুঃখে হতাশায় আমার তখন চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে।

লির মূর্খতা নিয়ে আমরা সরবে আলোচনা করতে থাকি। লোকটা হঠকারিতার ফলে শুধু যে নিজের প্রাণটা হারাল তাই নয়, ঐতিহাসিক জগতের এক অপূরণীয় ক্ষতি করে গেল। তাকে যে একবার ঘাড়ে ধরে নিয়ে এসে আচ্ছা করে শিক্ষা দেব তারও উপায় নেই। সে এখন সবার নাগালের বাইরে। সব দোষারোপের উর্ধ্বে।...

—আমার কনুইয়ে হঠাৎ এক মৃদু খোঁচা অনুভব করলাম। ফুশে ঠেলছে।—কি ?

ফুশে আঙুল দিয়ে দেখাল—লামাকে।

দেখি সে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রুমালটার পানে চেয়ে আছে। আর তার দু' চোখ দিয়ে জল ঝরছে—

লামা চিম্-পো আস্তে আস্তে আমাদের দিকে তাকাল। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল—হতভাগ্য লি! লোভের কি ভীষণ পরিণাম! ভগবান তথাগতের কাছে প্রার্থনা করি ওর আত্মার কল্যাণ হোক। ওকে আপনারা ক্ষমা করুন।

বড় লজ্জা হল মনে। আমার কাছে পুঁথির মূল্য কি ?

একটা মূল্যবান ঐতিহাসিক দলিল। ইচ্ছে ছিল—ঐ দলিল আবিষ্কার করে বাহাদুরি নেব। নাম হবে সেই সুযোগটা নষ্ট হল, তাই পুঁথিচোর লির ওপর এত চটেছি। এত আক্ষেপ।

কিন্তু স্বার্থপরের মতো শুধু নিজের কথাই চিন্তা করছি। জলজ্যান্ত মানুষটা যে প্রাণ হারাল তার জন্যে তো কৈ দুঃখ করছি না ?

আর লামার কাছে এ পুঁথি পরমপবিত্র, পূজনীয়। তারই নিজস্ব সম্পত্তি। কিন্তু পুঁথি হারানোর জন্য সে তো কৈ উত্তেজিত নয়। বরং যে হতভাগ্য প্রাণ দিল তার কথা ভেবেই ওর হৃদয় আকুল হয়ে উঠেছে। তার কাছে পুঁথি হারানোর ব্যথা ছাপিয়ে উঠেছে হতভাগ্য লির শোচনীয় পরিণামের বেদনা।

ইব্রাহিমদের ডাকলাম—চল ফিরি।

ক্যাম্পে ফুশেকে বললাম—মরীচিকা দেখেছ ?

—দেখেছি। কেন ?

—মরীচিকা কি করে ? পথিককে লোভ দেখায়। কাছে টানে—তারপর আচমকা মিলিয়ে যায়। তখন হয় নিদারুণ আশা ভঙ্গ। পুঁথির ব্যাপারটাও যেন তাই—

কোথাকার এক অখ্যাত লামা এসে হাজির হল। সঙ্গে দুর্মূল্য এক পুঁথি। আবার সে কথা দিল পুঁথিটা আমায় দান করবে। তারপর কত জল্পনা কল্পনা।—

ঐ পুঁথি নিয়ে রিসার্চ করব। পেপার লিখব। আমার নাম ছড়াবে সারা দুনিয়ায়। কিন্তু ঠিক হাতের মুঠোয় আসার আগে—ব্যস্, ফস্কে গেল।

মরুভূমির বুকে চিরদিনের মতো নিখোঁজ হল। মরীচিকা নয় তো কি ?

মাস্টারমশাই গল্প থামিয়ে উদাসনয়নে জানালার দিকে তাকালেন। বাইরে তখন ঘন অন্ধকার নেমেছে

তারপর? লামার কি হল?—তিনজনে উদগ্রীব হয়ে প্রশ্ন করে।

—লামা চিম্‌-পো পর দিনই বিদায় নেয়। আর তার কোন খবর পাই নি। যাবার আগে সে এই কষ্টি পাথরের বুদ্ধমূর্তিটা আমায় দিয়ে যায়। পুঁথিতো পেলাম না তার বদলে এই স্মৃতি উপহার।

মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুর শহরের কাজেই ছিল প্রাচীন রক্তমৃত্তিকা বিহার। এখন মাটির তলায় চাপা পড়ে আছে। সেই ধ্বংসস্তূপের কাছে লামা মূর্তিটা কুড়িয়ে পেয়েছিল।

সমাপ্ত

পুস্তক পরিচয়

কল্যাণী কার্লেকার

১

'ছড়াপিদ্দিম জ্বলে' জ্যোতিভূষণ চাকী রচিত, সীতেশ রায় চিত্রিত', প্রকৃতি দেবী প্রকাশিত। দাম দুই টাকা। প্রাপ্তিস্থান বুকস্ট্যাণ্ড। **৮১ কাঁকুলিয়া রোড, ১৯।**

নিপুণ ছড়াকার হিসেবে জ্যোতিভূষণ চাকীর নোতুন পরিচয়ের দরকার নেই। 'ছড়াপিদ্দিম জ্বলে' তাঁরই উপযুক্ত সংকলন। প্রথমদিকের কয়েকটি ছড়া অতিরিক্ত সংক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে পাঠকের কাছে অসম্পূর্ণ লাগে কিন্তু পরের গুলি ভাবে-রসে নিটোল। খাঁটি বাংলার ভাবভংগি আগাগোড়াই ফুটে উঠেছে।

পটের ছবি আর রথের মেলার মাটির পুতুলের আকারের ছবিগুলি আর সবুজ রেশমি ফিতেয় আটকানো নোতুন ধরণের বাঁধাই বইখানিকে বিশেষ সৌন্দর্য দিয়েছে।

২

'সাতরাজ্যির হেঁয়ালি'' সংকলন—আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—পত্রিকা সিণ্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, পি ১১ সি-আই-টি রোড,। **কলকাতা ১৪। দাম আড়াই টাকা।**

নানা দেশ থেকে হেঁয়ালি সংগ্রহ করে' বাংলা কবিতায় 'ছোটদের বড়দের উৎসর্গ করা হয়েছে। লেখা ছোটদের উদ্দেশ্যে কিন্তু বড়রাও পড়ে' খুশি হবেন, কেননা, হেঁয়ালির মোহ মানুষের কোনো বয়সেই যায়না। ধাঁধার মধ্যে কয়েকটি কষ্টকল্পিত হ'লেও অধিকাংশই সার্থক। বইয়ের 'গোড়ার কথা' হেঁয়ালির যে ইতিহাস দেওয়া হয়েছে সেটাও হেঁয়ালিগুলোর সমান উপভোগ্য। সংগৃহীত হেঁয়ালিগুলোর কোনটা কোন 'রাজ্যি' থেকে নেওয়া তার উল্লেখ থাকলে বইটা সর্বাংগসুন্দর হ'ত।

অযোগ্য

(বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে)

প্রসাদ রঞ্জন রায়

'অশোক', হেঁকে বললেন প্রদীপবাবু ; 'অঙ্কটার উত্তর কত হয়েছে ?'

অশোক বলল '৭ ফুট, স্যার !' প্রদীপবাবু ফেটে পড়লেন, '৭ ফুট ! জানো, অঙ্কটার উত্তর ৩১ টাকা ! তুমি কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ ?' একটু থেমে তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে বলতে থাকেন, 'ইতিহাস ক্লাসে তুমি বলেছিলে পানিপথের যুদ্ধে জিতেছিল ইস্ট্‌বেঙ্গল ক্লাব, প্রশান্ত সিংহ'র অধিনায়কত্বে ! পরশু দিন বিজ্ঞান ক্লাসে তুমি প্রমথবাবুকে বলেছিলে 'পরমাণু' মানে পায়স ! গত কাল বলেছ হাম্মুরাবি বাবরের ছেলে ছিলেন ! আজ আবার এই ! তোমার চালাকি আমি বন্ধ করছি।'

ক্লাস এইটের ছেলেরা গোমড়া মুখে এ ওর দিকে তাকায়। সবাই জানে অশোক ছেলে খুবই ভাল কিন্তু ছেলেবেলায় শক্ত অসুখ হয়ে ওর বুদ্ধিশুদ্ধি খুব কমে গেছে। কিন্তু প্রদীপবাবু শুনবেন না— রোজ ওকে বকাবকি মারধোর করেন। আর অশোকটাও তেমনি ! মারধোর খেয়েও সে প্রদীপবাবুর অন্ধ ভক্ত। অবশ্য হবে নাই বা কেন ! কে না জানে ওদের নতুন টিচার প্রদীপবাবু মস্ত ক্রিকেটার ! আর ক্রিকেটারদের ভক্তিশ্রদ্ধা করে না এমন ছেলে ওদের স্কুলে অন্ততঃ নেই।

প্রদীপবাবু বলেন 'তোমাকে মেরে কোনো ফল হয় না। ঠিক আছে কাল ছুটির পর তুমি আটকা থাকবে, যতক্ষণ না তুমি ২০টা বুদ্ধির অঙ্ক কর।' স্তম্ভিত হয়ে অশোক বলল 'স্যার্‌ ! কাল যে ১১৷৷০ টায় ছুটি তারপর টিচারদের সঙ্গে ছেলেদের ক্রিকেট ম্যাচ ! আপনার খেলা দেখব বলে আমি কবে থেকে আশা করে আছি।' কোনো লাভ হ'ল না, উল্টে অশোক ধমক খেল, 'পাকামী করো না।'

অথচ প্রদীপবাবু যে মস্ত প্লেয়ার সেটা অশোকেরই আবিষ্কার ! তিনি দাঁড়িয়ে নেট প্র্যাকটিস দেখছিলেন দেখে অশোক জিজ্ঞাসা করেছিল, 'স্যার্‌, আপনি ক্রিকেট খেলতেন ?' প্রদীপবাবু বললেন 'উ—হুম্‌—মানে—হ্যাঁ।' 'ভালো খেলতেন স্যার্‌ ?' আবার প্রশ্ন। উত্তর এল 'হুঁ—মানে আর কি বেশ ভালোই !' হঠাৎ অশোকের মনে পড়ল যে পি. বোস ব'লে একজন ইউনিভার্সিটি আর রাজস্থান ক্লাবে খেলতেন। বার দুই রঞ্জি ট্রফিও খেলেছেন। আর ইউনিভার্সিটিতে খেলার বছরগুলোও মিলে যাচ্ছে প্রদীপবাবুর সঙ্গে। বাড়ি গিয়েই অশোক পুরনো খবরের কাগজ থেকে কাটা ছবিগুলো মেলে বসল। হ্যাঁ, পি. বোসের ছবির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে প্রদীপবাবুর চেহারা। ছবিটা ক্লাসে আনতে

সবাই বলল যে যদিও ছবিটা একটু ঝাপসা তবু ওটা নিঃসন্দেহে প্রদীপবাবুরই। অবশ্য একটু লম্বা আর মোটা দেখাচ্ছে। অশোকের বন্ধু রজত বলল, 'খবরের কাগজের ছবি তো! কত আর ভাল হবে! কথাটা জানাজানি হতেই ক্লাস নাইনের ছেলেরা বলল—'ওতো আমরা জানি।' অবশ্য ওরা সব কিছুই নাকি আগে থাকতে জানে।

যাই হোক, পরের দিন সকাল থেকেই স্কুলে সাজসাজ রব। প্রত্যেক বছরই এই খেলাটা দিয়ে Season শুরু হয়। এই খেলায় কে কি রকম খেলে তার উপর নির্ভর করে স্কুল টিম নির্বাচন করা হয়। আর একটা আকর্ষণ, স্কুল ক্যাপটেন সুবীর সরকারের বাবা লেফটেনান্ট জেনারেল সরকার এই স্কুলেরই প্রাক্তন ছাত্র; তিনি বলেছেন যে এই খেলার শ্রেষ্ঠ ব্যাট্স্ম্যানকে তিনি একটি ব্যাট পুরস্কার দেবেন। বলা বাহুল্য, স্কুল টিমের ৭ জন ব্যাটসম্যানের ধারণা যে ব্যাট সে নিজেই পাবে। অবশ্য এবারে স্কুল টিম বেশ শক্তিশালী। অবশ্য টিচারদের দলেও ভালো খেলোয়াড় আছেন। গেমস্ টিচার আছেন। গেমস্ টিচার শামশের সিং, বলা বলা বাহুল্য, ভালো খেলেন। অঙ্কের টিচার ভুবনবাবু প্রৌঢ় বয়সেও ভালো খেলেন। কিন্তু এবছর তার উপরে আছেন প্রদীপবাবু—রঞ্জি ট্রফি প্লেয়ার।

সাড়ে এগারোটায় স্কুল ছুটি হল—সবাই ছুটল মাঠে। প্রদীপবাবু অশোককে বললেন, 'বস, অঙ্কগুলো কর। কি, চুপ করে বসে যে!' অশোক বলল, 'অঙ্ক যে আমি পারি না, স্যার্!' 'ওঃ, অঙ্ক পার না। তুমি কি পার শুনি? পড়াশুনো কেন, কোন কাজই তুমি পার না। তুমি সব কিছুরই অযোগ্য। অঙ্ক না করা অবধি তুমি আজ আটকা থাকবে বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন প্রদীপবাবু।

'আরে অশোক যে! আজ পড়াশুনো থাক না।' তাকিয়ে দেখে সাদা সার্ট-প্যান্ট প'রে হেডমাস্টার মশাই। ঘটনাটি শুনে তিনি মনে মনে বললেন, ছেলেমানুষের উপর এত জোর করা ঠিক নয়। অশোককে বললেন 'অঙ্কগুলো করেই ফেল না!' 'পারছি না যে, স্যার্!'—অশোকের উত্তর। 'আরে, এই দেখ—' —দেখতে দেখতে ২০টা অঙ্ক হ'য়ে গেল। 'এবার চল মাঠে, বলেই তিনি হঠাৎ বলেন 'অশোক, তুমি ক্লাস এইটের ক্রিকেট টিমে খেল না?' একটু লজ্জা পেয়ে অশোক বলে, 'হ্যাঁ, সার্।' 'খেলবে আজকে?' অশোক অবাক্! স্কুল টিমেতো শুধু ক্লাস টেন—ইলেভেনের ছেলেরা খেলে। তাকে থামিয়ে হেডমাস্টারমশাই বলেন, 'স্কুলের হ'য়ে নয়, আমার দলে। রাজেনবাবু অসুস্থ, সত্যেনবাবুর'ও হাতে ব্যথা। টিমে একটা জায়গা রয়েছে।' অশোক যেন হাতে স্বর্গ পায়।

স্কুল টিম টসে জিতে নামল ব্যাট করতে। ক্লাস এইটের সকলকে অবাক ক'রে দিয়ে অশোক ফিল্ডিং'এ নামে। স্কুলের ওপেনিং ব্যাটসম্যানেরা এ ওকে আশ্বাস দিচ্ছিল, 'ভয় কি! ভুবনবাবুতো একা দুদিক থেকে বোলিং করতে পারবেন না!' হঠাৎ তাদের মনে পড়ে গেল প্রদীপবাবুর কথা। আসামের বিরুদ্ধে ৬টা উইকেট নিয়েছিলেন পি. বোস। হেডমাষ্টারমশায়'ও সেই আশাতেই ছিলেন। কিন্তু প্রদীপবাবুকে বল দিতে যেতেই তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, 'না, স্যার্! বোলিং করতে পারব না। আমার-ইয়ে-গেঁটে বাত হ'য়েছে।' 'সে কি কথা! এই বয়সে গেঁটে বাত!! আমি যে তোমার উপর নির্ভর করছিলাম!!!'

ক্ষুণ্ন মনে হেডমাষ্টার মশায় নিজেই বোলিং করতে আসেন। তাঁর ঝোলানো বলে পরপর ৫টা চার মেরে শেষটায় অহীন বোল্ড হ'য়ে গেল। খেলছিল শ্যামসুন্দর আর প্রশান্ত। একটা বল কাট ক'রে ছুটতে আরম্ভ করল প্রশান্ত। বলটা ধরেই সোজা ছুঁড়লেন প্রদীপবাবু। উইকেট ভেঙ্গে গেল—রান আউট! অশোক মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখল—এমন নইলে আর রঞ্জি ট্রফি প্লেয়ারের ফিল্ডিং! শুধু ভুবনবাবু মাথা নাড়লেন—তিনি প্রদীপবাবুর অন্যান্য বলগুলো ধরার ব্যর্থ চেষ্টা দেখেছিলেন।

যাই হোক, একটু পরেই ভুবনবাবু একটা উইকেট নিলেন। একসঙ্গে খেলতে লাগল প্রবীর আর সঞ্জীব—দুই ভাই। দ্রুতবেগে রান উঠতে লাগল। প্রবীর উইকেটের চারদিকে মেরে খেলছিল। দেখতে দেখতে ১৫০ রান উঠে গেল। তারপর প্রবীর ভুবনবাবুর একটা বল না দেখে ড্রাইভ করতে গেল। অশোক ছুটে এসে ক্যাচ লুফে নিল। তখন প্রবীরের রান ৮৯। ভুবনবাবু মিঃ সিংকে বললেন, 'দেখুন, এ ছেলেটি ভবিষ্যতে ভালো প্লেয়ার হ'বে। প্রবীরের পর নামল ক্যাপ্‌টেন—সুবীর সরকার। সে ২৫ রান করে আউট হ'লে পর ভুবনবাবুর বলে বাকি উইকেটগুলি চটপট পড়ে গেল। মোট রান হ'ল ২৩১—সঞ্জীব ৭১ নট আউট। সঞ্জীব বলল, 'প্রবীর, ব্যাটটা তুই পাবি।' প্রবীর বলল 'নারে, তুই নট আউট ছিলি—তোরই পাওয়া উচিত।'

হেডমাস্টারমশায় বললেন, 'প্রদীপবাবু, আপনি আর মিঃ সিং আগে নামুন।' ভয়ানক ব্যস্ত হ'য়ে প্রদীপবাবু বললেন, 'না, স্যার্—আমার গেঁটে বাত—' হেডমাস্টার মশায় এবারে বেশ বিরক্ত হ'লেন—ব্যাটিং করবে না, বোলিং করবে না—এই আবার রঞ্জি ট্রফি প্লেয়ার! এই বয়সে আবার গেঁটে বাত কি!! যখন তিন নম্বর বা চার নম্বর নামতেও প্রদীপবাবু আপত্তি করলেন, তখন বিরক্ত হ'য়ে তিনি বললেন 'তবে সব শেষে নামবেন।' প্রদীপবাবু যেন একটু আশ্বস্ত হ'লেন।

গোমড়ামুখে হেডমাস্টারমশায় নামলেন। জেতার আশা এখন আর নেই। কিন্তু আশাতীত ভালো খেললেন তাঁরা। হেডমাস্টার মশায় ৩৬ আর মিঃ সিং ৭২ করে আউট হলেন। যখন অশোক নামল রান তখন ৬ উইকেটে ১৯৯—ভুবনবাবুর রান ৮৩। অশোক গার্ড নিয়ে দেখেশুনে প্রত্যেকটি বল খেলছিল। এক বন্ধু ঠাট্টা করে বলল, 'সাবাস! কপিবুক ক্রিকেট!! ব্যাটটা দেখছি তুই-ই পাবি!!!' কিন্তু পরের ওভারে সুবীরের প্রথম বলেই ভুবনবাবু কট আউট হ'য়ে গেলেন। বয়স হয়েছে—টাইমিং ঠিক মত হয় না।

খেলতে এলেন মৌলভী সায়েব। এসেই সজোরে ব্যাটটা ঘোরালেন বলটা সোজা লাগল মিড্‌ল স্ট্যাম্পে। ম্লান হেসে বললেন, 'বারো বছর খেলছি আজ অবধি একটাও রান করতে পারিনি।' পণ্ডিত মশায় এলেন—এসেই কট অ্যাণ্ড বোল্ড। হ্যাটট্রিক। ৯ উইকেটে ১৯৯। চারদিকে হাততালি পড়ছে। তার মধ্যে নামলেন প্রদীপবাবু। সুবীর ভাবল, এই রে! এইবার আমার বোলিং ছাতু হয়ে যাবে। নেমেই তিনি অশোককে ডেকে কি যেন বললেন। হেডমাস্টার মশায় বললেন, 'যাক্, অশোককে একটু উপদেশ দিচ্ছে। এক্সপিরিয়েন্সড লোক—'

শুনলে অবাক্ হয়ে যেতেন যে প্রদীপবাবু অশোককে বলছেন 'অশোক একটু পিটিয়ে খেল—

আমায় যেন বেশী বল খেলতে না হয়।' তিনি গার্ড নিলেন না (ব্যাপারটার অর্থই তাঁর বোধগম্য হয়নি)। যেভাবে কোনোক্রমে তিনটে বল তিনি ঠেকালেন যে সুবীর প্রায় হেসেই অস্থির। পরের ওভার খেলতে গিয়ে অশোকের মনে হল প্রদীপবাবুর গলা, 'তুমি সব কিছুরই অযোগ্য।' অযোগ্য! দেখাচ্ছি মজা! রাগের মাথায় অশোক স্কুল টিমের ফাস্ট বোলার অমিতের বলে দুটো বাউণ্ডারী মারল। শেষ বলে নিল এক রান। পরের ওভারে সুবীরের বলেও তাই। দর্শকরা অবাক্। দেখতে দেখতে রান উঠল ২২৫। অমিত বোলিং করতে এল। প্রথমেই বোলারের পাশ দিয়ে স্ট্রেট ড্রাইভ বাউণ্ডারী! পরের বলটা স্টাম্প ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। তৃতীয় বলটা সে হুক করল—আবার বাউণ্ডারী! খেলা শেষ। অশোক ৩৩ নট আউট।

ক্লাস এইটের ছেলেরা ভেবেছিল যে প্রদীপবাবুর উপর রাগেই অশোক তাঁকে একটাও বল খেলতে দেয়নি। কিন্তু অশোক চুপ। শুনে সুবীর আর অমিত হাসল—তারা লক্ষ্য করেছিল প্রদীপবাবুর হাঁটু কাঁপছিল ভয়ে! শুধু যে অন্যান্য ছেলেরাই অবাক্ হল তা নয়—অবাক হল অশোকও। প্রবীর আর সঞ্জীবের সঙ্গে কথা বলছিলেন জেনারেল সরকার। অশোককে দেখে এগিয়ে এসে বললেন, 'কন্‌গ্র্যাচুলেশন্‌স্। কি ব্যাট চাই তোমার? হ্যাঁ, প্রাইজটা তুমিই পেলে। সবাই আমার সঙ্গে একমত। 'ঠাট্টা করে যা বলা হয়েছিল তাই শেষে সত্যি হল।'

এরপর থেকে, প্রদীপবাবু অশোককে মারধোর আর করেন নি। অশোকেরও অন্ধ ভক্তিটা কমে গিয়েছিল। তবে, স্টাফ স্টুডেণ্ট ম্যাচে প্রদীপবাবু আর কোনোদিন খেলেন নি। ভুবনবাবুর কথাও সত্যি হয়েছিল—পড়াশুনোয় খারাপ হলেও অশোক কালক্রমে স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি আর বাংলা রাজ্যদলের নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় হয়েছিল।

ও হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, ম্যাচটা শেষ হবার পরের দিন আনন্দবাজার পত্রিকায় বেরিয়েছিল, 'বাংলা দলের রঞ্জি ট্রফি খেলোয়াড় শ্রীপ্রদীপ বোস এবছর অক্সফোর্ড দলে খেলবেন। তিনি গত দুই বছর অক্সফোর্ডে আছেন।' ক্লাস নাইনের ছেলেরা বলেছিল, 'এতো আমরা আগেই জানতাম। ছবিটার সঙ্গে চেহারাটা হঠাৎ মিলে গেছে—খবরের কাগজের ছবি তো!'

॥ ছড়া ॥

অরবিন্দ কুমার দে

হঠাৎ সেদিন উঠল ঝড়ের নৃত্য
দীন মজুরের কাঁপল ভয়ে পিত্ত
ভাঙল কুঁড়ে, হারাল সব বিত্ত
দালান কোঠায় ঠাণ্ডা বাবুর চিত্ত

ভূমিকম্পে ঘরবাড়ি সব কাঁপল
প্রাসাদগুলো ভীষণ রবে ভাঙল
নয়ন জলে ধনীর বুক ভাসল—
দীন ভিখারী একটু শুধু হাস্‌ল॥

(পনেরজন ভারতীয় স্কুলের ছেলেমেয়ে টন্টামোরার স্বাধীনতা উৎসবে যোগ দিতে আসতে গিয়ে ব্রান্টালুসি পর্বত ও ঘন জঙ্গলময় উপত্যকার মধ্যে প্রবল ঝড়ে নিখোঁজ হয়ে যায়।

সাময়িকভাবে সমস্ত আনন্দউৎসব স্থগিত রাখা হল। পাহাড়ের কোলে তির্নিকা গ্রাম থেকে, হেডমাস্টার আরডনের নির্দেশে মিডি, কিকু ও হকোর নেতৃত্বে তিনটি উদ্ধারকারী দল তিনদিক দিয়ে অনুসন্ধান সুরু করল। মাজিনকোর গভীর জঙ্গল ঘন কুয়াশায় ঢাকা। তার উপরে আবার সেখানে শয়তান গ্রাটেনকোর উৎপাত।

ওদিকে, তিনজন গুরুতরভাবে আহত হওয়া সত্ত্বেও ছেলেমেয়েরা নিজেদের সামলে নিয়ে উদ্ধারকারী দলের জন্য অপেক্ষা করছিল। কিন্তু স্টেনগান হাতে গ্রাটেনকো তাদের বন্দী করে ফেলল। প্যারাসুটে নামিয়ে দেওয়া রেডিও-যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ধারকারীরা এই খবর পেল।

তারা সংকেতে খবর পাঠাল যে রাত্রে উদ্ধারকারী লোক নামবে। ছেলেমেয়েরা সংকেত বুঝে উত্তর দিল। ওদিকে ধীরে ধীরে ডাকাত গ্রাটেনকোর মনের পরিবর্তন হচ্ছে।)

॥ ৬ ॥

সারাদিন চোখে দূরবীণ লাগিয়ে বসে থেকে থেকে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল মিডি। সামনের ধুধু ঘন জঙ্গলের কোথাও জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নেই। সমস্ত জঙ্গলটা যেন মানুষগুলোকে একেবারে গিলে ফেলেছে।—এমন করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে বিরক্তি লাগছিল ওর। অনেক আশা নিয়ে এসেছিল ও। ভেবেছিল চকমির তাকে বসে সমস্ত উদ্ধার কাজটাকে ও সাহায্য করতে পারবে।—ওর চেষ্টায় মানুষগুলো বাঁচবে।—কিন্তু শয়তান গ্রাটেনকোর শয়তানিতে মানুষগুলো সব হারিয়ে গেছে আজ। চুপচাপ দূরবীণ চোখে দিয়ে বসে থাকা ছাড়া আর কোন কাজ নেই তাই ওর। বেলা পড়ে এলো। গাছের মাথায় পাখিরা ফিরতে সুরু করেছে। দলের

লোকেরা গরম চায়ের পাত্র এগিয়ে দিয়ে গেল সামনে। দূরবীণ নাবিয়ে রেখে তাই হাতে তুলে নিল ও! মন ওর ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে। আজও রাত বারটার সময় যখন রেডিও যোগাযোগ করবে ওরা তখন সেই একই কথা বলতে হবে ওকে।—কোন খবর নেই।

এ খবরে কারও কোন উপকার হবে না। চুচুমুক দিয়েছে কাপে। হঠাৎ দক্ষিণ মাজিনকোর দিকে নজর গেল ওর। ওটা কি! টিবল্লি নদীর মরা খদের প্রায় দক্ষিণ ঘেঁসে ওকি দেখা যাচ্ছে? তাড়াতাড়ি চায়ের কাপ নাবিয়ে রেখে দূরবীণ হাতে তুলল ও। আরে—এতো যেন মনে হচ্ছে ধোঁয়া! কুণ্ডলি পাকিয়ে পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে আকাশের গায়ে। ভাল করে আবার ও দেখল। না কোন সন্দেহ নেই—ধোঁয়া। ওখানে কোন জঙ্গল নেই। দাবানল নয় এটা। এ ধোঁয়া মানুষের হাতের কাজ। খুশিতে চেঁচিয়ে উঠল মিডি। ওর চিৎকার শুনে এগিয়ে এল দলের অন্য কজনে।

—কি দেখছ ওখানে?

সবাই বলল—ধোঁয়া। ধোঁয়া যে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

—তার মানে কি?

—মানে একটাই। ওখানে লোক আছে। বলল একজন।

—এখবর এখুনি তবে ওদের জানাতে হবে।

—কিন্তু রাত বারটার আগে রেডিও যোগাযোগ করা বারণ। মনে থাকে যেন।

—না, এ হুকুম আমি মানবো না! বলল মিডি। কেন যে ধোঁয়া তার কারণ কি কিছু বুঝতে পারছ?

—না।

—এমনও তো হতে পারে শয়তান গ্রাটেনকো একটা কিছু ভীষণ সর্বনাশ ঘটাচ্ছে। চুপ করে রাত বারটার জন্য বসে থাকা উচিত হবে না। হয়ত তাতে ভীষণ দেরী হয়ে যাবে।

চাবি টিপে রেডিও যন্ত্র তখুনি চালিয়ে দেওয়া হল।

—হ্যালো হ্যালো। মিডি বলছি।

হোলখ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল—মিডি! এমন সময়ে যে?

—সে কথা পরে—শোন এখন একটা ঘটনা ঘটেছে যে এখুনি খবর দেওয়া দরকার।

হোলখের ডাক শুনে আরডন ছুটে এলেন। এলেন প্রেসিডেন্ট। এলেন জেনারেল।

—জরুরী খবর স্যার—মিডির কাছ থেকে।

—কি খবর? ব্যস্ত হয়ে প্রেসিডেন্ট জিজ্ঞাসা করলেন।

মিডি বলল—টিবল্লি নদীর মরা খদের ভিতর থেকে কুণ্ডলি পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে। কাছে কোথাও জঙ্গল নেই। দাবানল নয়। এ আগুন মানুষের করা। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। মনে হয় শয়তান গ্রাটেনকো কিছু সর্বনাশ ঘটিয়েছে!

তাড়াতাড়ি ম্যাপ বিছিয়ে ঠিক কোথা থেকে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে সে জায়গাটা চিহ্নিত করে নিলেন আরডন।

—তোমার মতে কি করা উচিত এখন? মিডিকে জিজ্ঞাসা করলেন আরডন।

—সঠিক যখন কিছুই বোঝা যাচ্ছে না তখন এখুনি প্লেন উড়িয়ে ভাল করে সন্ধান নেওয়া উচিত বলে মনে করি। বলল মিডি।

—বেশ, তুমি সারাক্ষণ নজর রাখ ভাল করে। নতুন কিছু দেখলেই জানাবে। আমরা আলোচনা করে যা করার করব। বললেন আরডন।

পাশের ঘরে মিটিংয়ে বসলেন সকলে। কি করা উচিত এখন এটাই তাঁদের আলোচনা। এ ধোঁয়া যে মানুষের হাতের করা আগুনের তাতে কারও কোন সন্দেহ নেই। এ ব্যাপারটা নতুন। তবে সব দিক ভাল করে ভেবে দেখেই কাজ করা উচিত। নইলে বিপদ হতে পারে।

জেনারেল বললেন—যাক একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আমার সেনাবাহিনীকে আর আন্দাজে কোন কাজ করতে হবে না। তাদের নাবার জায়গা আমি ঠিক করে ফেলেছি। ঐ সন্দেহজনক জায়গার চার পাশে নাবাই হবে তাদের প্রধান কাজ।

—কিন্তু তাদের নাবার সময় কি এর ফলে এগিয়ে যাবে? প্রশ্ন করলেন আরডন।

—আর কি দেরী করা উচিত হবে? পাল্টা প্রশ্ন করলেন জেনারেল।

—প্রথমে আমাদের ভাবতে হবে এ ধোঁয়া কেন। এ কি গ্রাটেনকোর কাজ, না অন্য কিছু? বললেন প্রেসিডেন্ট।

—যদি তাই হয়। তবে কি যে সে করেছে বোঝার কোন উপায় নেই। যদি খারাপই কিছু ঘটে থাকে তবে তো সৈন্য নাবানোর প্রশ্নই আর নেই।

—তা কেন—বললেন আরডন। একটা কথা ভুললে চলবে না। আমাদের সংকেত ওরা বুঝতে পেরেছে। সে সংকেত বোঝার পরেই এই ধোঁয়া। এমনও তো হতে পারে—ওরাই কোন মতে গ্রাটেনকোর চোখে ধুলো দিয়ে এ সংকেত আমাদের দিচ্ছে শুধু কোথায় তারা আছে বোঝাবার জন্য।

জেনারেল বললেন—তাই যদি হয় তবে সে সংকেত আমরা দেখতে পেয়েছি তা তো এতক্ষণে গ্রাটেনকোর নজরেও পড়েছে। সে কি তবে আর চুপ করে বসে থাকবে? তার প্রতিহিংসা যে কি হতে পারে ভাবা যায় না। আমার মনে হয় আর দেরী করা উচিত হবে না।

প্রেসিডেন্ট বললেন—আপনি কতক্ষণের মধ্যে আপনার কাজ সুরু করতে পারেন জেনারেল?

—ঘণ্টা চারেক সময় লাগবে আমার। তবে আমি চেষ্টা করব সে সময় কমিয়ে দিতে।

—বেশ এখুনি তবে আপনি আপনার আদেশ জারি করুন।

—আরডন বললেন—এ চার ঘণ্টা তো গ্রাটেনকো বসে থাকবে না। আমার মনে হয় আরও কিছু আমাদের করা উচিত।

—কি করতে চান আপনি? জিজ্ঞাসা করলেন প্রেসিডেন্ট।

—হকোর শেষ খবরে জেনেছি সে প্রায় টিবল্লি নদীর মরা খদের কাছ বরাবর পৌঁছেছে। সে খবরও কাল রাতের। এতক্ষণে সে আরও এগিয়েছে। এখুনি তাকে হুকুম করা হোক সে যেন তার দল নিয়ে ছুটে যায়। সৈন্যবাহিনীর আগেই সে বোধ হয় পৌঁছোতে পারবে সেখানে।

—এখুনি এ খবর তাকে দেওয়া হোক,—স্থির গলায় প্রেসিডেন্ট হুকুম দিলেন। তবে সবার কাছে আমার এ অনুরোধও যেন পৌঁছে দেওয়া হয়। অস্ত্রের সাহায্য ছাড়া একাজ উদ্ধার হলে আমি সব থেকে বেশী খুশি হব। কখনও আমরা যেন না ভুলি—বহু বিদেশী শিশুর জীবনমরণ নির্ভর করছে আমাদের সবার উপরে। গ্রাটেনকো আমাদের লক্ষ্য নয়। তাদের ফিরিয়ে আনাই আমাদের উদ্দেশ্য।

হোলখ্ আবার রেডিও চালিয়ে দিল। একবার চেষ্টা করেই মিড়ির সাথে আবার যোগাযোগ করল ও।

তাকে সমস্ত ঘটনা জানাল। শুনে খুশি হল মিডি।

কেউ কোথাও নেই দেখে হোলিখ বলল—এখুনি হকোকে রেডিওতে চাই। বলতে পার কি করে তাকে ডাকা যাবে?

—অসম্ভব—বলল মিডি। রাত বারটার আগে তো তার সাথে আমার যোগাযোগ হবেনা। কি করে তাকে বোঝাব এখন? সে যে কোথায় আছে তাও জানি না।

স্তম্ভিত ভাবে হোলখ বলল—একটা বেআইনি কাজ করতে পার? দেখো সে কথা যেন আবার কারও কানে না যায়। তবে মুস্কিল হতে পারে।

—কি করতে চাও বল?

—তোমার বন্দুক থেকে ঘন ঘন বেশ ক রাউণ্ড গুলি চালাও শূন্যে। সে আওয়াজ নিশ্চয়ই নীচে হকোর কানে যাবে। ও তা হলেই, নিশ্চয়ই নিয়ম ভেঙ্গে আমার সাথে যোগাযোগ করবে ব্যাপার কি জানতে চাইবে। ব্যাস তাতেই আমার কাজ হবে।

—তাকে কি তোমার খুব জরুরী দরকার?

—নিশ্চয়ই। এখুনি তাকে দরকার।

—বেশ। বলল মিডি। আমি এখুনি আট দশটা ফায়ার করছি। দেখ তাতে তোমার কাজ হয় কি না।

—ধন্যবাদ। বলল হোলখ্।

* * * *

স্বরু থেকেই কোন রকম নিয়ম মানে নি হকো। রাতে চলা ধাতে সয়না ওর। তাছাড়া, যে ব্যাপারে ও এসেছে তাতে যে সময়ের দাম কত তা কি বোঝে না ওরা? হুকুম যখন এলো দিনের আলো এড়িয়ে চলতে হবে তখন থেকে ও অবশ্য যতদুর সম্ভব তা মেনে চলতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু সে শুধু নিয়ম মানার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। এতগুলো পুরোদস্তুর সেনা বাহিনীর লোক রয়েছে ওর সাথে আর ও কিনা ভয় করে চলবে একটা খুনে ডাকাতকে?—তবে হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ও আদেশের পিছনে ভীষণ কোন কারণ আছে। তাই যতটুকু না মান্‌লেই নয় ততটুকু ও মেনেছে। এর ফলে মোট লাভ হয়েছে এই যে ও এগিয়েছে অনেকখানি। আসপাশের সন্দেহ জনক বহু জায়গা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছেও!

দায়িত্বের দুঃশ্চিন্তা থাকলেও—এর জন্য মনে মনে ও বেশ গর্বিত। ফিরে গিয়ে সবাইকে এ নিয়ে বেশ বড় করে গল্প করতে পারবে। আর সত্যি যদি ঐ বিদেশী শিশুদের খুঁজে বার করতে পারে—তবে?

তবে নিশ্চয়ই সারা দেশ ওকে মাথায় তুলে নাচবে।

হকোর বয়স খুবই কম। সে তুলনায় যে দায়িত্ব ও পেয়েছে তা খুবই গুরুতর। সাধারণত এমন হয় না। কিন্তু মাস্টারমশাই আরডন তাঁর ছাত্রকে ভাল করেই চিনতেন। জানতেন যত ছেলেমানুষিই ওর মধ্যে থাকুক না কেন—ওর দায়িত্ববোধ ভীষণ। এবং তার জন্যই শেষপর্যন্ত ওর সব কাজই সুষ্ঠুভাবে করতে পারে। নিয়ম মানুক না মানুক—হকো এগিয়ে চলেছে ঠিক।—সমস্ত সন্দেহজনক জায়গাগুলোকে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে। মনে মনে ঠিক করে নিয়েছে ও—যদি ডাকাত গ্রাটেনকোর সাথে সত্যিই দেখা হয়, ওর—তবে সৈন্যদলের সবাইকে ও সরে থাকতে বলবে। একাই লড়বে গ্রাটেনকোর সাথে।—আর সে লড়াই যত ভয়ঙ্কর হবে ততই ও দেশের লোকের

কাছে বীর বলে পরিচয় পাবে। তবে হ্যাঁ—সবার আগে ঐ বিদেশী শিশুদের কথা।—তাদের প্রয়োজনে যা করা দরকার আগে তাই করতে হবে ওকে। তাতে লড়া হোক বা না হোক।

সন্ধ্যা প্রায় ঘনিয়ে এসেছে। নিয়ম ভেঙ্গে সারা দিন একটানা পথ চলার পর সমস্ত দলই ক্লান্ত! তার উপরে প্রতি পদে লুকিয়ে চলতে হয়েছে নিজেদের। তার দায়ও কম না। সবার মনে তখন এক চিন্তা সর্দার থামার হুকুম দেবে কখন? —সবার মনের কথা হকো পড়তে পারে বোধ হয়। হঠাৎ ও হুকুম জারী করল—থামো। সবাই পিঠের বোঝা ফেলে বসে পড়ল।

যেখানে থামল ওরা সেখান থেকে মাইল চারেক দূরেই চৌচির হয়ে ফাটা জমির সুরু। শুনেছে হকো ভূতত্ত্ববিদরা গবেষণা করে বলেছেন আগে টিবল্লি নদীর ধারা এদিক দিয়েই বয়ে যেত। ১১০৬ এর বিরাট ভূমিকম্পের পর ছোট ব্রাণ্টালুসিতে যে ধ্বস নাবে তাতে টিবল্লি নদীর প্রবাহ সম্পূর্ণ দিক পরিবর্তন করে। এখনকার এই নদী সেই পরিবর্তনের ফল। এছাড়াও দক্ষিণ মাজিনকোর বুকের উপরে দুজায়গায় বিরাট ফাটলের সৃষ্টি হয়। তেমন একটা জায়গা পেরিয়ে এসেছে হকো আগেই।

সামনে দেখা যাবে—দ্বিতীয়টা! হকোকে খুঁজে বেড়াতে হবে ঐ সব ফাটলগুলোর ভিতরে। তার পরেই ওর ফিরতি যাত্রা সুরু হবে টিবল্লির মরা খদ ধরে।

সঙ্গিরা খাবারের আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। হ্যাভারস্যাক নাবিয়ে একটা ছোট পাথরে হেলান দিয়ে বসল হকো। পকেট থেকে ম্যাপটা বার করে বিছাল সামনে। ঘণ্টা দুই বিশ্রাম। তার পরেই আজ রাতের মতন যাত্রা শেষ করতে হবে ঐ ফাটা জমির ধারে পৌছে। হুঁসিয়ার হকোর বোধহয় একটু তন্দ্রা মতন এসেছিল—হঠাৎ চমকে উঠল ও। ওকি!!! চকমির তাক থেকে পর পর ভেসে এল ঘন ঘন বন্দুকের আওয়াজ!! না কোন সন্দেহ নেই তাতে। মিডি বিপদে পড়েছে। ভীষণ বিপদে—এ তারই সংকেত। নিশ্চয়ই ওর রেডিও যন্ত্র খারাপ হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই গ্রাটেনকো ওকে আক্রমণ করছে। নয়ত এমন কিছু বিপদ ঘটেছে যা ওকে অসহায় অবস্থায় ফেলেছে। দলের অনেকেই এসে দাঁড়াল পাশে। তারাও শুনেছে শব্দ। এক সেকেণ্ডেই মন ঠিক করে ফেলল হকো।—রেডিও চালিয়ে এখুনি হোলখের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করতে হবে। যোগাযোগ হলে তাদের মতামতের উপরে নির্ভর করতে হবে। নইলে দল ভেঙ্গে এক দলকে পাঠাতো এখুনি চকমির তাকে।—

—হ্যালো, হ্যালো…

হোল্খ বলল—তোমাকেই খুঁজছি হকো।

—মিডির ভীষণ বিপদ হয়েছে:…

—না। আমার হুকুমেই ও আওয়াজ করেছে তোমাকে সজাগ করবে বলে।

—কেন? ব্যাপার কি?

—ধোঁয়া দেখ নি তুমি?

—না। কোথায় ধোঁয়া? কিসের ধোঁয়া?

—টিবল্লি নদীর মরা খদে। উত্তর ফাটল জমির আন্দাজ ছ সাত মাইল দক্ষিণে।—

—সে জায়গা আমরা পার হয়ে এসেছি দুপুরে।

—এখুনি ফিরে যাও সেখানে। ধোঁয়া মানুষের করা। দেখ গিয়ে কি হয়েছে সেখানে।

—এখুনি আমরা যাত্রা করছি।

ভাল করে জিজ্ঞাসা করে ম্যাপের উপরে মোটামুটি জায়গাটাকে ঠিক করে নিল হকো।—

—আর কোন হুকুম আছে?

—আছে। প্রেসিডেণ্টের হুকুম—গুলি চালানো চলবে না। মনে রেখ বহু বিদেশী শিশুর জীবন নির্ভর করছে তোমার কাজের উপরে।—

—মনে থাকবে একথা আমার।—দরকার হলে আমি প্রাণ দেব তাদের জন্য।

—ধন্যবাদ। তোমার ভাল হোক।

গরম জলের পাত্র উল্টে ফেলে দিল ওরা। হাভারস্যাকগুলো উঠল পিঠে। সবাই প্রস্তুত। একটা কিছু ঘটার সম্ভাবনায় সবাই যেন কেমন গম্ভীর হয়ে পড়েছে হঠাৎ। খাওয়া পরে হবে। বিশ্রাম? তার এখন দরকার নেই। ক্লান্তি? ও কিছু না। শিশুদের উদ্ধার করে, ও কথা ভাবা যাবে। গ্রাটেনকো? হাজার গ্রাটেনকোকেই ওরা এখন আর ভয় করে না—এসো, এগোও সকলে—

সবার আগেই এগোলো হকো তার পিছনে অন্য সকলে। কোনরকম শব্দ করবে না। কথা একদম বন্ধ। এমন কি নিশ্বাসও যেন জোরে না নেওয়া হয়। শয়তান গ্রাটেনকো বড় সজাগ! থামাও চলবে না। চলতে হবে জোরে। হাতের বন্দুকগুলোর কথাও ভুলে থাকতে হবে। হোলখকে শেষ খবর দিয়েছে হকো—আশা করি সন্ধ্যে ঘনিয়ে আসার আগেই আমরা সেখানে পৌঁছাতে পারব। সে কথার যেন বিশেষ নড়চড় না হয়। চল চল-যত জোরে পার সবাই চল।

ও ধোঁয়া কিসের? ওকি গ্রাটেনকোর কাজ? তবে তো সর্বনাশও হতে পারে। অন্য কোন কারণও থাকতে পারে! তাই যেন হয়। আর যাই হোক ও ধোঁয়া মানুষের কাজ। সে মানুষ এ জঙ্গলে ঐ বিদেশী শিশুরা ছাড়া আর কে হতে পারে?

—চল চল তাড়াতাড়ি চল। দেরি হয়ে গেলে সারা দেশের কাছে আর কোন কৈফিয়তই দেওয়ার থাকবে না। সে লজ্জায় পড়ার থেকে মরা ভাল।

সন্ধ্যা এড়ানো গেল না। সন্ধ্যার মুখোমুখি নদীর খদের ঢালু জমির পাড়ে এসে পৌঁছাল ওরা। একটু থামল হকো। এর পর কোন দিক বেয়ে নাববে ওরা? সামনের আধমাইল জায়গা ঘুরে ডান দিকে বাঁদিকে যত দূর নজর যায় আঁকাবাঁকা টিবল্লির মরা খদ হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু কোন দিকে ওদের খোঁজ পাওয়া যাবে? বেশী ভেবে কোন লাভ নেই। হাতে এমন কোন সঠিক নিশানা নেই যা থেকে ঠিক জায়গাটাকে খুঁজে নেওয়া যেতে পারে। সুতরাং মিথ্যা চিন্তা না করে কাজে নেবে পড়াই উচিত।

তাই করল হকো। মরা খদের ঢালু কিনারা দিয়ে নীচের দিকে নামতে শুরু করে দিল ওরা। একবার ভেবেছিল ও সারা দলটাকে ছোট ছোট করে নানান জায়গায় ছড়িয়ে দেবে! কিন্তু তাতে লাভের চেয়ে বিপদ বেশী বলেই মনে হয়েছে ওর। এক সাথে থাকলে হয়ত কিছু দেরী হবে, তবে তাতে কাজ হবে ভাল।

অল্প কিছুদুর নেবেই বুঝতে পারল হকো কাজটা খুব সহজ হবে না। সারা খদটা বছরের পর বছর বৃষ্টির জলে ধুয়ে ধুয়ে ভীষণ রূপ নিয়েছে। মাটি নেই কোনখানেই। বালি বা নুড়িতে ভরা সমস্ত জায়গাটা। ছোট শুকনা কাঁটা ঝোপের জঙ্গলে ছাওয়া চারদিক। প্রতি পদক্ষেপে ডাইনে বাঁয়ে মাটি ধুয়ে যাওয়ার ফলে হাঁ করে থাকা এঁকাবেঁকা গভীর ফাটল। কতদুর যে চলে গেছে তা কে জানে? কোন কোনটা তার এত চওড়া যে তার মধ্যেও গ্রাটেনকোর মতন শয়তানের লুকিয়ে থাকা অসম্ভব নয়। শুনে এসেছিল টিবল্লি নদীর মরা খদ গোলক

ধাঁধার মতন। একবার ঢুকলে সারা জীবনেও পথ খুঁজে বার হওয়া যাবে না। আজ নিজের চোখে দেখে সে কথা মিথ্যা বলে মনে হল না হকোর। খদের ভিতরে রাত ঘনিয়ে আসছে। উপরের পৃথিবী এতক্ষণে নিশ্চয়ই অন্ধকার হয়ে গেছে।

অন্ধকারে মানুষকে একেবারে অন্ধ করে না। কিন্তু এ ভীষণ গভীর খদের অন্ধকার ওদের সবাইকে যেন একেবারে অন্ধ করে দিল। এক হাত দূরের জিনিসও দেখা যায় না। প্রতিপদে সকলেই হোঁচট খেতে লাগল। কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই। উপরের পৃথিবীতে নিঃশব্দেরও যেন কেমন একটা সুর শোনা যায়। এ গভীর খদ নিঃশব্দ, যেন মরা। সেই মরা নিঃশব্দের মাঝখানে শুধু ওদের ভারি বুটের একঘেঁয়ে আওয়াজ খদের দুপাশের ঢালু দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলে উপরের দিকে মিলিয়ে যাচ্ছে, সে আওয়াজ বিরক্তিকর।

হকোর মনে হল ধরা পড়ে যাবে ওরা। থামলে মনে হয় সারা পৃথিবী মরে গেছে! চললে পায়ের আওয়াজ গোপন করা যায় না।—

চাপা গলায় হকো বলল—মাঝে মাঝে টর্চ জালতে হবে। আমরা কোথায় যাচ্ছি কিছুই বুঝতে পারছি না। আর সাবধান। গ্রাটেনকোর সাথে আচমকা দেখা হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়—বন্দুক সামনে রাখবে সকলে। কেউই একথায় সাড়া দিল না। চলার তালে বলার কথা ওরা ভুলে গেছে।—শুধু গ্রাটেনকোর নামটা ওদের কানের মধ্যে বিঁধে গেল যেন।—বন্দুকের মুখ নাবিয়ে ও লোকটাকে কি বশ করা যাবে?

আরও কিছুক্ষণ কাটল। হকো তখন ভাবছে—দু মিনিটের জন্য সবাইকে একটু বিশ্রাম করার সময় দেবে নাকি।—ঠিক তখনি একটু দূরে পাশের ঢালু পাড় বেয়ে গড়িয়ে পড়ল বেশ কতগুলো বড় বড় পাথরের নুড়ি। তার পরেই কেমন যেন কতগুলো শব্দ হল ফাটলটার মধ্যে, ধপ করে কি যেন পড়ল সেখানে। আন্দাজে বুঝল হকো—ঠিক সামনের ফাটলের মধ্যেই ঘটল যা কিছু। এক পাও আর না এগিয়ে সেখানেই থেমে পড়ল হকো—বলল দাঁড়াও সকলে।

গ্রাটেনকো! নইলে কোন জানোয়ার—বন্দুক বাগিয়ে দলের সকলে এগিয়ে এল কাছে।

—হুকুম দাও আমরা এগোবো।—

—না দাঁড়াও সকলে। বলল হকো। কেউ এগোবে না। যাই হোক না কেন, যাব আমি একা আগে অস্ত্র ছাড়া। আমার ডাক শুনে পরে যাবে তোমরা।—এ আমার হুকুম। অন্য কোন রকম কিছু করা হয় না যেন!—

বড় টর্চটা জ্বালাল হকো। সামনে আলো ফেলে দেখল কোথাও কিছু নেই। শুধু ডান দিকে ফাটলের অন্ধকার মুখটা বিভৎস দেখাচ্ছে।—বিপদ তার মধ্যেই। সেখানেই ঢুকতে হবে ওকে—বন্দুক নাবিয়ে রাখল হকো নাবাল হ্যাভারস্যাকটা। টর্চটা হাতে নিয়ে দুপা এগিয়ে গিয়ে স্পষ্ট গলায় চেঁচিয়ে উঠল—আমি একলা আসছি গ্রাটেনকো আমার হাতে কোন অস্ত্র নেই। বিশ্বাস তোমাকে করতেই হবে আমার কথা। আমাকে মারতে হলে তুমি মারবে, কেউ বাধা দেবে না তোমাকে। তবুও আমি আসবো। তোমার সাথে আমার দেখা হওয়া দরকার। তাতে দুজনেরই ভাল হবে গ্রাটেনকো।

দলশুদ্ধ সবাই বন্দুক হাতে নিয়ে স্তম্ভিত হয়ে দাড়িয়ে রইল। ধীর অথচ শক্ত পায়ে এগোলো হকো।' শুধু ওর উপরেই নির্ভর করছে ঐ ভীষণ ডাকাতটাকে বশ করা। নইলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। এখনও তো কেউ জানে না কোথায় আছে বন্দীরা। ফাটলের মুখে এসে আলো ঘোরানো হলো। সামনেই একটা বাঁক। তারপরে আর কিছুই দেখা যাবে। জোরে জোরে পা ফেলে এগোলো হকো, বাঁক ফিরেই আলো সোজা ফেলল। সামনে কয়েক গজ দূরেই বুকের উপরে দুহাত মুড়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক। আলোয় তার চোখে স্পষ্ট

দেখা গেল। একটু এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল হকো—তুমি গ্রাটেনকো?—

চুপ করে রইল লোকটা কিছুক্ষণ, তারপর বলল—

—এসো আমার সাথে, বন্দীরা কোথায় আছে দেখিয়ে দিচ্ছি।—এসো তাড়াতাড়ি।

—তোমার পরিচয় দেবে না?

—তার কি কোন দরকার আছে? বন্দীদের ভাল যদি চাও তো এসো।—

—আমার সঙ্গে আরো লোক আছে!

—জানি। তাদেরও ডাক।

—তারা সেনাবাহিনীর লোক। আমার মতন এত সহজে তোমাকে নাও ছাড়তে পারে।

লোকটা বিরক্তির সাথে বলল—এত কথা কেন? কাজ কর। তার জন্যই তো তোমাদের পাঠানো হয়েছে। জানো কি বন্দীদের মধ্যে এমন আহত আছে যাকে এখুনি হাসপাতালে নেওয়া উচিত।

এর পর আর কোন কথা চলে না। আলোয় ভাল করে দেখেছে হকো লোকটার হাতে কোন অস্ত্র নেই। সুতরাং একে ভয় করার কোন মানেই হয় না। অন্য কোন বদ মতলব আছে ওর তাও মনে হয় না। থাকলে সবাইকে ডাকতে বলত না।

এমন লোকের পরিচয় দিয়ে কি হবে আর। আর সে কথা তো আগে নয়। আগে আহতদের কথাই ভাবা উচিত।

তারপর না হয় চেষ্টা করা যাবে তার পরিচয় খুঁজে বার করার। লোকটাই যে গ্রাটেনকো—তাতে অবশ্য কোন সন্দেহ নেই হকোর।

হকো বলল—আচ্ছা তুমি এসো আমার সাথে। সামনেই আমার লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। ভয় নেই তুমি যেই হও না কেন তারা তোমার কোন ক্ষতি করবে না—

একথা শুনে লোকটা হটাৎ হেসে উঠল ভীষণ ভাবে। ওর হাসির শব্দে চমকে উঠল হকো—বাপ্‌রে মানুষেও এমন করে হাসতে পারে নাকি!

লোকটা বলল—কে আমার কি ক্ষতি করবে সে ভয় আর আমার নেই, যা হবার তা হয়ে গেছে।

এখন তুমি এগোও তাড়াতাড়ি—

আর কোন কথা না বাড়িয়ে এগোলো হকো। ফাটলের মুখেই সকলে ছটফট করছিল ওর অপেক্ষায়। ওদের দুজনকে বার হতে দেখেই বন্দুকের ট্রিগারে হাত রাখল সকলে তা বেশ স্পষ্টই বুঝতে পারল হকো।—ও কিন্তু কাউকেই কিছু বলল না। লোকটাও কোন কিছুর দিকে ফিরেও দেখল না।

—এসো তোমরা। বলে বড় বড় পা ফেলে এক দিকের খদ ধরে হাঁটতে সুরু করে দিল।

কতবার যে ডাইনে বাঁয়ে ফিরতে হল ওদের তার হিসাব আর থাকল না কারও। অসম্ভব গোলমেলে পথে লোকটা চলেছে কেমন নিশ্চিন্ত মনে। অন্য সবার মনে তখন ভীষণ দুঃশ্চিন্তা।

কি মতলব লোকটার কে জানে।—কোন অদৃশ্য বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে না তো সবাইকে?

ঘণ্টা খানেক সমানে চলে হঠাৎ যেন সবার মনে হল—সামনের বাঁকের মুখে আলোর আভাস দেখা যাচ্ছে। লোকটাও এগোলো সেই দিকে। একটা বাঁক ফিরতেই বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল সে আলোর আভাস। আরও ক'পা এগোতেই দেখা গেল ভীষণ চওড়া হয়ে গেছে মরা নদীর খদ। এক পাশের দেওয়ালের গায়ে এক গুহা মুখের সামনে দাউ দাউ করে এক মশাল জ্বলছে সে, আলোর সামনে বসে একজন—

দলের সবাই হঠাৎ ছুটতে সুরু করে দিল। পাথুরে জায়গায় জুতোর আওয়াজ যেন কাঁপিয়ে তুলল চারদিক। অবাক হয়ে দেখল লোকটা কিন্তু এ সুযোগে পালাবার চেষ্টাও করল না। চুপ করে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইল শুধু। আলোর সামনে যে বসে ছিল হঠাৎ এত লোকের পায়ের আওয়াজ শুনে সে চম্‌কে উঠে দাঁড়াল। তারপর তার গলা দিয়ে বার হল এক অদ্ভুত আনন্দের চিৎকার। লোকটার চিন্তা মন থেকে দূর হলো। ধীর পায়ে এগিয়ে গেল সামনে। ততক্ষণে চিৎকার শুনে গুহার ভিতরে থেকে দলে দলে সবাই বাইরে বার হয়ে আসতে সুরু করেছে। যেন সবাই এরই জন্য জেগে বসেছিল। সৈন্য দল গিয়ে তাদের ঘিরে ধরল। কেমন আছো তোমরা?

—কার কার আঘাত লেগেছে?

—তোমার নাম কি?

—ডাকাতটা কোথায়? এখুনি বাঁধবো তাকে!

কিছুক্ষণ কেউই কারও কথা শুনল না। অনেক চেষ্টা করে সবাইকে শান্ত করল হকো।

রাণা বলল—আসুন আপনারা সবাই ভিতরে। অনেক জায়গা আছে। নিশ্চয়ই সবাই আপনারা ক্লান্ত। এখুনি চায়ের ব্যবস্থা করা হবে। হকো বললো—কিন্তু গ্রাটেনকো? তার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা হবে? কথ বলতে বলতে ওরা সবাই গুহার ভিতরে ঢুকল।

—সে তো এখানে নেই এখন, রাণা বলল।

—আছে। সেই তো আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে।

—সেই পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে? অবাক রাণা।

—হ্যাঁ তাই মনে হয়। নইলে এ জঙ্গলে পথ দেখাতে আসবে কে আর?

—কোথায় সে?

—বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

তাড়াতাড়ি রাণা বাইরে গেল। এদিক ওদিক খুঁজল। না, কোথাও গ্রাটেনকো নেই। ফিরে এসে, জানালো সে কথা।

—সে কি? তবেতো সে পালিয়েছে।

তনুকা বলল তার কথা যাক। এখন আমাদের তাড়াতাড়ি এখান থেকে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হোক।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। বলল হকো। আমি এখুনি রেডিও যোগাযোগ করে সব ব্যবস্থা করছি।

তখুনি হকো রেডিও চালিয়ে দিল—

—হ্যালো। হ্যালো

ঘুম জড়ানো গলায় হোলখ্‌ উত্তর দিল—খবর কি তোমার হকো? সন্ধ্যে তো অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে।

প্রেসিডেন্টকে জানানো হোক আমারা বন্দীদের উদ্ধার করতে পেরেছি। গ্রাটেনকোকে বন্দী করা যায় নি। এখুনি হেলিকপ্টর পাঠানো হোক।

ওদিকে চেঁচিয়ে উঠল হোলখ্‌—ধন্যবাদ। ধন্যবাদ হকো, আমি এখুনি এখবর জানিয়ে দিচ্ছি। তবে তুমিও শুনে রাখ হকো দেরী দেখে আমাদের সৈন্যদলও রওনা হয়ে গেছে এই কিছুক্ষণ হল। হয়তো তুমি প্লেনের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ। ওরাও এখুনি নাববে। গ্রাটেনকোকেও আর পালাতে হবেনা। ও ধরা পড়বেই।

তখুনি হকো শুনতে পেল মাথার উপরে প্লেনের গর্জন। বলল—হ্যাঁ আমি প্লেনের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। তুমি আমাদের এখুনি এখান থেকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে বল। বিশেষ করে আহতদের।

খবর পৌঁছল প্রেসিডেন্টের কাছে। খবর শুনলেন জেনারেল। হুকুম দিলেন তিনি যে করে হোক গ্রাটেনকোকে বন্দী করতেই হবে। তার বিচার চাই। সে আদেশ দিল তার সৈন্যবাহিনীর সকলকে সারা জঙ্গল মরা নদীর সমস্ত খদ ঘিরে তন্ন তন্ন করে ওরা খুঁজে চলল।

* * *

সৈন্য বাহিনীর সাথে এলো ডাক্তার এলনাস, এলেন আরডন। এলো নানান জিনিস। ওষুধপত্র, খাবার। সারা গুহা জুড়ে বিরাট যেন একটা হাসপাতাল বসে গেল।

মনে মনে সকলেই খুশি হলেও কেন যেন সবার মন খারাপ হয়ে গেল। গ্রাটেনকোর সম্বন্ধে এরা এতটুকুও দয়া দেখাতে রাজী নয়!

রাণা, টম, বিলি হামিদুল আর মুংলি গিয়ে দাঁড়াল তম্বুকার সামনে—একি হল? আমরা তো বলেছিলাম ওকে—ওর কিছুই হবে না।

তম্বুকা বলল—দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয়।

ওদের কেমন যেন মনে হল তম্বুকাদিদি আর যেন ঠিক আগের মতন নেই। হাসপাতালের কড়া শাসনে ওদের সবাইকেই শুয়ে পড়তে হয়েছিল। ঘুমিয়েও পড়েছিল ওরা।

হঠাৎ বাইরে গোলমালের শব্দ উঠতেই সবার ঘুম ভেঙ্গে গেল। কারও কোন বারণ না শুনে রাণা উঠে পড়ল। তার দেখাদেখি অন্য অনেকে।

বাইরে গিয়ে দেখল—নতুন একদল সৈন্য ফিরেছে টহল দিয়ে এখুনি। সঙ্গে তারা ধরে এনেছে গ্রাটেনকোকে। বিরাট শক্ত শিকল দিয়ে বাঁধা গ্রাটেনকো দাঁড়িয়ে আছে এক পাশে মাথা নীচু করে। আর সৈন্যবাহিনীর সকলেই ওকে টিটকিরি দিচ্ছে।

কেমন যেন বিচ্ছিরি লাগল রাণার। এগিয়ে গিয়ে গ্রাটেনকোর সামনে দাঁড়াল ও। ফিরে দাঁড়িয়ে সমস্ত লোকদের দিকে তাকিয়ে ধমকে উঠল!

—কি করছ তোমরা? ওকে বেঁধেছো কেন? খুলে দাও। খুলে দাও এখুনি।

ওর কথা শুনে অবাক হয়ে সকলে থমকে গেল। এমন যে হবে তা কেউই ভাবতে পারেনি। কেউ কোন উত্তরই দিতে পারল না।

রাণা চেঁচিয়ে উঠল—কোথায় তোমাদের দলপতি? ডাকো তাকে—ওকে এখুনি খুলে দিতে হবে। ওর কথার মধ্যে এমন জোর ছিল যে একজন সত্যি ছুটে গেল মেজরের খোঁজে। তখন ভোর হয়ে গেছে। খদের ভিতরেও দিনের আলো ঢুকেছে। সৈন্যদলের আলোগুলোও নিভিয়ে ফেলা হয়েছে। খবর পেয়ে মেজর ছুটতে ছুটতে এলো।

—এখুনি হেলিকপ্টর নাববে খবর পেলাম। যাও তোমরা তৈরী হয়ে নাও গিয়ে। আগে যাবে আহতরা তারপর তোমরা।

রাণা বলল—একে ছেড়ে দিন এখুনি।

—সে ক্ষমতা আমার নেই। বলল মেজর।

—ও তো কোন দোষ করে নি!

—সে বিচার আমি করব না। আমার উপরে অন্য হুকুম আছে। আমাকে তাই মানতে দাও।

—কিন্তু এতো অন্যায়। ভীষণ অন্যায়…।

হঠাৎ গ্রাটেনকো বলল—ক্যাপ্টেন…তুমি যাও। আমার জন্য তুমি ভেবো না। এই বোধ হয় ঠিক হল। শয়তান গ্রাটেনকোর শেষ—যা সকলেই চায়। আমার পাওনা আমাকে নিতে দাও।

—কিন্তু…রাণার কথা শেষ হল না। আকাশে সারি সারি হেলিকপ্টর দেখা গেল।

মেজর বলল—আর দেরী কর না! তুমি যাও। তোমার দেরী হলে মিছিমিছি সবাই আটকা পড়ে যাবে। যাও তুমি।

ফিরতে হল রাণাকে।

—কি হল? এক সাথে সবাই জিজ্ঞাসা করল ওকে।

—না, ওকে ছাড়া হবে না। বলল রাণা। ওকে অমন করে শিকলে বেঁধেই রাখা হবে।

সবার মন খারাপ হয়ে গেল।

* * *

সারা পৃথিবীতেই খবরটা রটে গেল। হকো—বীর হকো বন্দীদের উদ্ধার করেছে। আর কোন ভয় নেই। আগামী কাল সকালেই তাদের ফিরিয়ে আনা হবে। গ্রাটেনকোকে বন্দী করার সব রকমের চেষ্টা করা হচ্ছে। আশা করা যায় সেও ধরা পড়বে।

পরদিন সকাল থেকেই তির্নিকা গ্রামে মেলা বসে গেল। সারা রাত ধরে পথ চলে এসেছে এমন লোকও যুটল সেখানে। আর এল দেশ বিদেশ থেকে সাংবাদিকরা। এলো তাদের হাজার রকমের ক্যামেরা আর—নানান প্রশ্ন। মাঝ রাতে গুজব রটল গ্রাটেনকো ধরা পড়েছে। তবে তার আগে অন্তত কম করে সে পঁয়তাল্লিশ জনকে ঘায়েল করেছে!! দৌড়াদৌড়ি পড়ে গেল সাংবাদিকদের মধ্যে। কেউ ঘুমল না সে রাত্রে তির্নিকা গ্রামে একটু পরেই পাকা খবর এলো—না বাজে কথা ধরা পড়ে নি গ্রাটেনকো। তবে জোর লড়াই চলেছে—দ্বিতীয় ফাটা চৌচির জমির ভিতরে। কি হয় বলা যায় না। আবার ছুটোছুটি সুরু হয়ে গেল সাংবাদিকদের। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল সে খবরও বাজে। শেষ রাতে কারা যেন লাউডস্পিকারে চেঁচাতে সুরু করল—শয়তান গ্রাটেনকোকে জনতার হাতে তুলে দিতে হবে, তারাই তার বিচার করবে জ্যান্ত পুড়িয়ে। পুলিশ তাদের থামিয়ে দিল অনেক কষ্টে। প্রথম কাক ডাকল যখন—তখন জানা গেল—আহতেরা ভালই আছে। সবাই ফিরবে সকালেই এ খবর দিলেন—গভর্ণমেণ্টের মুখপাত্র।

সাংবাদিকেরা তাকে ধরল—গ্রাটেনকো? তার খবর কি?

—না তার কোন খবর নেই।

ভোর হয়ে গেল। মেলা জমে উঠল তির্নিকাতে। তির্নিকা না ঘুমাক কাল রাতে, সমস্ত টাণ্টামোরা রিপাবলিক কাল কিন্তু ঘুমিয়েছে আরামে।

সকাল থেকেই—হকো, মিডি, আরডন আর কিকুর ফটো বিক্রি সুরু হয়ে গেল। সবার ভিড় হকোর ফটোর জন্য। সে আজ সারা টাণ্টামোরার বীর। কিছু পরেই হেলিকপ্টর উঠল আকাশে।

কিছুক্ষণেই সে গুলো পেরিয়ে গেল বড় ব্রাণ্টালুসির চূড়া। মাইকে ঘোষণা করা হল স্কুল ময়দানের মাঠে সবাইকে নাবানো হবে। সবাই যেন শৃঙ্খলার পরিচয় দেয়। রেডক্রসের গাড়ির পেছনে ব্যাঘাত না করে যেন। ব্যাস ভীড় আস্তে আস্তে জমা হতে সুরু করল—স্কুলের মাঠে। কিছুক্ষণ পরেই প্রেসিডেণ্ট জেনারেলকে সঙ্গে নিয়ে

হাজির হলেন সেখানে। সাংবাদিকরা ছুটোছুটি করে ছবি তুলল টেলিভিসনের ক্যামেরাগুলো মাথা তুলে দাঁড়াল চারদিকে। প্রেসিডেন্ট আর জেনারেলের মুখে আজ হাসি। জনতার উদ্দেশ্যে তাঁরা হাত নাড়লেন।

ঠিক তখুনি কোথা থেকে যেন মাইকে ঘোষণা করা হল। আপনাদের সবাইকে একটা সুখবর দেওয়া হচ্ছে। এই মাত্র জানা গেল আমাদের বীর সেনাবাহিনী শয়তান গ্রাটেনকোকে বন্দী করেছে।···ঘোষণার বাকি কথাগুলো আর শোনা গেল না। পাগল হয়ে সবাই তখন লাফাচ্ছে, চেঁচাচ্ছে! সে চিৎকার থামতে না থামতেই আকাশের গায়ে সারি সারি হেলিকপ্টর দেখা গেল।

মুহূর্তে শান্ত হল জনতা। ছুটে এলো রেডক্রসের গাড়ি। প্রথমটা থেকে নামল স্ট্রেচার। তোলা হল তা এ্যাম্বুলেন্সে। ছুটে চলে গেল এ্যাম্বুলেন্স। হাজার ছবি উঠল। নানান কথাও উঠল ভিড়ের মধ্যে

কে? কি হয়েছে ওদের?

তনুস্কা। আমাদের বীর এয়ার হোস্টেস ঐতো প্রাণ দিয়ে বাঁচিয়েছে এদের।

—আর কে সঙ্গে?

—আমিনা খাতুন।

—গ্রাটেনকোর গুলিতে আহত হয়েছে?

—শয়তানটকে ছিঁড়ে ফেলা উচিত।

—ওর ফাঁসি হবে দেখিস।

দ্বিতীয়টা থামল এসে। নামল তার থেকে একদল ছেলে মেয়ে। ঠিক তেমনি করে ছবি তোলা হল। তেমনি করে কথার ঢেউ উঠল জনতার মধ্যে।

—দেখেছিস কি হাল করেছে গ্রাটেনকো ওদের।

এগিয়ে এলেন প্রেসিডেন্ট। কারা যেন মালা পরিয়ে দিল সবাইকে। প্রেসিডেন্ট বললেন—বীর তোমরা। এই দেশের সবার পক্ষ থেকে আমি তোমাদের সবাইকে সাদরে গ্রহণ করছি।

জনতার আনন্দ চিৎকারে আর কোন কথাই শোনা গেল না। কারা যেন এগিয়ে এসে ওদের সবার হাত ধরল—কারা যেন গাড়ি নিয়ে এলো। সমস্ত ভীড় দুপাশে সরে গিয়ে পথ করে দিল।—কিন্তু ভাল করে বোঝার আগেই দেখল ওরা একটা বড় গাড়িতে বসে আছে সকলে। আর সে গাড়ি ঝড়ের গতিতে ছুটে চলেছে পাহাড়ি পথের ঢল বেয়ে রাজধানী টাণ্টামোরার দিকে।

—আমরা ফিরে এসেছি। বিড়বিড় করে বলল রাণা।

—হ্যাঁ। বলল টম।—কিন্তু ভাল লাগছে না।

—গ্রাটেনকো কি লোক খারাপ ছিল? বিলি জিজ্ঞাসা করল।

—না। আমাদের সে কি করেছে? বলল হামিদুল।

—তাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত। বলল মুংলি।

—আমরা প্রেসিডেন্টকে বলব। বলল গুরুদিৎ।

—সেই ভাল। ওরা সবাই এক সাথে বলল।

বাসের হর্ন বেজে উঠল। ওরা সামনের দিকে তাকিয়ে দেখল—সামনে অল্প দূরে সহর দেখা যাচ্ছে—মস্ত সহর। টণ্টামোরা রিপারলিকের রাজধানী টণ্টামোরা।

সেখানে তখন চলেছে উৎসবের আয়োজন—স্বাধীনতা উৎসব কদিন পরেই॥—

=শেষ=

প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর

দিগদর্শী প্রকৃতি-পড়ুয়া ডারউইন

জীবন সর্দার

'জুনোমিয়া' বইটি লিখেছিলেন ডাক্তার ইরেসমাস ডারউইন। তিনি চার্লস রবার্ট ডারউইনের দাদু। বইটির একজায়গায়, বিবর্তনের কথা ভেবেই হয়তো তিনি লিখেছিলেন, 'যে সব প্রাণীর রক্ত 'গরম' তারা সবই একই সূত্র থেকে এসেছে—একথা ভাবলে কি খুব সাহসের পরিচয় দেওয়া হবে?'

দাদুর লেখা বইটির কথা চার্লস তাঁর বাবার মুখে শুনেছিলেন। চার্লস ডারউইনের জন্ম, তোমরা জান, ফেব্রুয়ারী মাসের বারো, আঠারশ' ন' সালে। পড়াশুনা করার চেয়ে তাঁর নুড়ি কুড়োনো, পোকামাকড় ধরা, পাখির ডিম খোঁজ করায় ঝোঁক ছিল বেশি। তাঁর বাবা এসব অপছন্দ করতেন না, অপছন্দ করতেন পরীক্ষায় পাওয়া তাঁর খারাপ নম্বরগুলোকে। তাঁর বাবা ডাক্তার রবার্ট ওয়ারিং ডারউইন চাইতেন না আট বছর বয়সে মাতৃহারা ছেলেটি পড়া ফেলে সারাদিন প্রকৃতি-পড়া আর খেলা নিয়ে মেতে থাকে। সময়মত চার্লসকে তিনি ডাক্তারী পড়তে পাঠালেন। পড়া ছেড়ে পালিয়ে এলেন চার্লস—অপারেশন টেবিলে ছোট্ট একটি ছেলের কান্না শুনে। এবার ঠিক করলেন যাজক হবেন।

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যাজকবৃত্তি পড়ার সময় শিকারে বেরতেন দলবেঁধে, আর পোকামাকড় ধরে দেখতেন। আর উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক রেভারেণ্ড হেন্‌স্‌লর সাথে ঘুরে ঘুরে প্রকৃতি বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করতেন। জুনোমিয়া বইটি আবার পড়লেন। সৃষ্টিরহস্য নিয়ে গ্রীক দার্শনিকদের কি মত তা পড়লেন, লামার্কের লেখাও পড়লেন। নিঃসন্দেহে এই সব চিন্তা ভাবনা তাঁর মনকে নাড়া দিয়েছিল। কি মনে করে কে জানে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি পরীক্ষার শেষে দক্ষিণ সমুদ্রে বেড়াবার একটি সুযোগ পেয়ে তিনি নেচে উঠলেন।

ডেভেনপোর্ট বন্দর থেকে 'বিগল' জাহাজটি নোঙর তুলে রওনা হলো ১৮৩১ সালের ২৭শে ডিসেম্বর! ডাঙা ছেড়ে দূরে যেতে না যেতেই ডারউইন অসুস্থ হয়ে পড়লেন। শুয়ে শুয়ে সময় কাটাতে একখানি বই তুলে নিলেন। বইখানি চার্লস লিয়েলের লেখা প্রিনসিপ্‌ল্‌স্‌ অব জিওলজি। বইটিতে প্রাকৃতিক শক্তিগুলি, বৃষ্টি, ঝড়, হাওয়া ভূমিকম্প এগুলিই ভূপৃষ্ঠের রূপ বদলে দিচ্ছে আর কিছু নয়, কথাটি পড়ে ডারউইন অভিনব এক চিন্তার খোরাক পেলেন। নতুন যেখানেই জাহাজ ভেড়ে, ডারউইন

চার্লস লিলের বই পড়ে সেখানকার অতীত ভূপ্রকৃতি জানার চেষ্টা করেন। বর্তমানকে বুঝতে চেষ্টা করেন।

জাহাজ যখন চলে, ডারউইন জাহাজের পেছনে মাছ ধরার একটি জাল বেঁধে দিতেন। তাতে যা কিছু ধরা পড়তো তুলে নিয়ে দেখতেন। খুব আশ্চর্য হতেন অজানা কিছুর দেখা পেলে আর নতুন পাওয়া জিনিসের সাথে অতীতের কোন প্রাণীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখে। ঠিক বছর খানেক বাদে বিগল দক্ষিণ আমেরিকার টেরা-ডেল-ফিউগোতে বাঁধলো। সেখানকার ঠাণ্ডা আবহাওয়ার সাথে খাপ খাইয়ে খালি গায়ে মানুষগুলো যেভাবে বেঁচে রয়েছে, তাদের দেখে ডারউইনের মনে হলো প্রকৃতি ভুল করেনি। জাহাজটি যতই দ্বীপ থেকে দ্বীপে কূল থেকে কূলে ভিড়লো, ততই নতুন নতুন অভিজ্ঞতার চমক ডারউইনকে চমকে দিয়ে 'নতুন কোন কিছুর' সূত্রের সন্ধান দিয়ে যেতে লাগলো। গালাপাগোস দ্বীপগুলোতে গিয়ে সবচেয়ে অবাক হলেন তিনি। আগ্নেয়শিলার দ্বীপগুলি, তিনি ভেবেছিলেন, নির্জন জনপ্রাণীশূন্য। না, তাতো নয়। কোথাও দেখা পেলেন অতিকায় কচ্ছপের, পৃথিবীর আর কোথাও অমনটি দেখা যায় না। কোথাও দেখলেন তিন চার ফুট লম্বা অতিকায় সব গিরগিটি। কোন দ্বীপের সমুদ্রতীরে কালোপাথরের পিঠে শুয়ে রোদ পোহাচ্ছে কালো কালো অতিকায় গিরগিটি। সাগর থেকে দূরে ডাঙার ভেতরে লালচে বাদামী আর এক জাতের গিরগিটির দেখা পেলেন। এদের মত দেখতে গিরগিটিদের দেখা আর কোথাও তিনি পান নি।

ডারউইন পোকা মাছ শামুক গাছ সব কিছুরই একটি করে নমুনা জোগাড় করে নিলেন। পাখিও বাদ গেল না। ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপে এক জাতের কীট পতঙ্গ গাছপালা কচ্ছপ আর পাখির ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখে কেউ কি অবাক না হয়ে পারে?

২রা অকটোবর, ১৮৩৬। বিগল জাহাজটি ইংলণ্ডে এসে ভিড়ল। ডারউইন যা কিছু দেখেছিলেন লিখে রেখেছিলেন তাঁর নোট বইয়ে। সেখানকার মাটি গাছ ফুল কীটপতঙ্গ মাছ পাখি সব কিছুরই কথা, তাদের হাবভাব, গড়ন ধরণ এসব নিয়ে লিখতে পারতেন। তিনি তা লিখলেন না। তার মাথায় এমন একটি চিন্তা ঘন হয়ে রূপ নিচ্ছিল যেটি প্রকাশ করবার সঙ্গে সঙ্গেই বদলে গেল মানুষের ধ্যান ধারণা—সৃষ্টি তত্ত্বের যে ব্যাখ্যা এতকাল শুনে এসেছে সবাই মিথ্যা হয়ে গেল তা।

ভেবনা, ঘরে ফিরেই চার্লস তাঁর মতামত লিখতে বসে গেলেন। ক্রমবিবর্তনের ফলেই আজকে আমাদের এই রূপ—এই চিন্তা তাঁর মাথায় তখন মাত্র এসেছে। ১৮৩৭ সালের মার্চে তাঁর প্রথম বই 'দা ভয়েজ অব দা বিগল' (বিগল জাহাজের সমুদ্রযাত্রা) বইটি বেরয়। বইটি সাজিয়ে গুছিয়ে লিখতে গিয়ে অতীত আর বর্তমানের প্রাণী আর উদ্ভিদের মিল বা গরমিল আরো ভালো করে নজর করলেন।

মিলের মূলসূত্রটি তিনি বুঝতে পেরেছিলেন কিন্তু বোঝাতে সাহস পাচ্ছিলেন না। তাঁর জোগাড় করা তথ্যগুলো থেকে তিনি একটি তত্ত্বে হাজির হয়েছিলেন। ছোট করে লিখে সেটি প্রকাশ করলেন ১৮৪২ সালে।

দু'বছর পর আরও একটু বড় করে তাঁর মতামত আবার প্রকাশ করলেন। ঐ কথাই ১৮৫৯

সালে, অভিব্যক্তি বা ক্রমবিবর্তনের তত্ত্ব, তাঁর অরিজিন অব স্পিসি বইটিতে প্রকাশ করে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক মহলকে চমকে দিলেন। কাল্পনিক নয়, চোখে দেখে হাতে নেড়ে পরীক্ষা করে সৃষ্টিতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখা প্রকাশ করলেন চার্লস রবার্ট ডারউইন।

বইটি বেরবার সঙ্গে সঙ্গে সব কখানা বিক্রী হয়ে গেল। বইটির শেষ অধ্যায়ে তিনি একটি বাক্য জুড়েছিলেন, যার মানে—মানুষের উৎপত্তি আর ইতিহাস জানায় ঐ বইখানি সাহায্য করবে। মানুষের জন্ম ইতিহাস নিয়ে তাঁর লেখা বই 'দা ডিসেনট অব ম্যান' বেরয় ১৮৭১ সালে। সেখানা পড়লে কোথা থেকে কেমন করে এলাম, একথা বুঝতে এখন আমাদের আর কোন অসুবিধা হবে না।

তোমার কি ইচ্ছে করে না প্রকৃতি-পড়ুয়া হয়ে খুঁজে বেড়াই পৃথিবীর যেখানে যত পশুপাখি গাছপালা আছে আর দেখি তাদের হাবভাব। তারপর সবার জন্য পৃথিবীটাকে আরও সুন্দর আর সুখের করে তুলি ?

আগে ও এখন

অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আগে যখন ছোট ছিলাম
ঠিক বুবুনের মতো
তখন আমি রোজ কাঁদতাম
দিনে রাতে কত,
পাশের বাড়ির বুবুন যেমন
ওঙা ওঙা কাঁদে...
আগে যখন ছোট ছিলাম
ঠিক বুবুনের মতো।
চাঁদ দেখিয়ে মা আমাকে
গল্প বলতো কত,
মা ও আমি গল্পে গানে
পৌঁছে যেতাম চাঁদে।

এখন আমি বড় কিনা
কাঁদি-না আর তাই,
খাইয়ে দিতে হয়-না এখন
নিজের হাতেই খাই ;
যেমন করে বাবু হয়ে
লালটুদাদা খায়...
এখন আমি পড়তে বসি
সকাল-সন্ধ্যা হলে,
খেলার সময় খেলি গিয়ে
থাকি-না মা'র কোলে ;
বড় হলে কেউ কি আবার
কোলে উঠতে চায় !

বিজ্ঞানের আসর

মানুষ-খেকো মাছ

মোহিত রায়

মানুষ মাছ খায়। আবার আজব দুনিয়ায় মানুষখেকো মাছও আছে। ইংরেজিতে এই ভয়ংকর হিংস্র মাংসাশী মাছের নাম Piranha characid. তবে আমাদের দেশে এই মাছ নেই। আছে আমেরিকা আর আফরিকার সমুদ্র অঞ্চলে। দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন নদীতে এবং ব্রেজিলের সানফ্রানসিসকো নদীতেও এই মাছ দেখা যায়।

মাছের আকার নানারকম। দুই ইঞ্চি থেকে পাঁচ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। আকারের ভেদ হলেও এরা সকলেই হিংস্র এবং মাংসাশী। গোলাকার এদের গঠন। দেহের দুপাশে আছে পাখনা- মুখের দুপাশে আছে সারিসারি করাতের মতো তীক্ষ্ণ দাঁত। এদের দাঁত ক্ষুরের মতো ধারালো। জলের যে কোনো প্রাণীর দেহ থেকে সহজে মাংস কেটে খেতে পারে—এমন কি কুমীর—হাঙর—তিমির মাংসও এরা খায়। এদের রং কালো। এরা কখনও একা থাকে না। দল বেঁধে থাকে।

দলে সব সময়েই দশ থেকে পনের হাজার মাছ থাকে। এদের গতি তীব্র—রক্তের গন্ধ পেলেই তীরবেগে হাজার হাজার মাছ সেখানে ছুটে যায়।

সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা হল যে এরা যে প্রাণীকেই আক্রমণ করুক না কেন—এক মিনিটেরও কম সময়ে তার দেহের সমস্ত মাংস খেয়ে নিঃশেষ করে ফেলে। কল্পনা করা যায় না এদের কাণ্ড! বড় তিমি-মাছ যার ওজন একশো পাউণ্ড—তাকে খেতে এদের সময় পোনে এক মিনিটের বেশি লাগে না।

এদের হাতে প্রাণ হারায় আমেরিকার আদিবাসীরা। মাছ ধরতে জলে নামামাত্রই এদের দল এসে আক্রমণ করে নিমেষেই খেয়ে শেষ করে ফেলে। পরে কেউ এসে তার কোন চিহ্নই খুঁজে পায় না। কিন্তু কি অদ্ভুত যে আমেরিকার অধিবাসীরা এই মাছ ধরে রান্না করে খায়! এই মাছের মাংসে বেশ স্বাদ আছে। তারের জালে এই মাছ তারা ধরে। তোলার সময় সময় জাল টপকিয়ে এবং জাল কেটে অনেক মাছ বেরিয়ে যায়। কয়েকটা থাকে। তারা অনেক সময় অধিবাসীদের আঙুল কামড়ে দেয়।

এই মাছ জলের বড় ছোট মাঝারি সব রকমের মাছ খায়। তাই এই মাছ যেখানে থাকে সেখানে আর কোনো মাছ থাকে না! এছাড়া; জলজ উদ্ভিদও এই মাছের এক জাত খায়। এরা কখনও এক জায়গায় থাকে না—শিকারের খোঁজে দলবেঁধে ঘুরে বেড়ায়।

এরা ডিম পাড়ে—পাঁচদিনের ভিতরে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়।

আমেরিকার মৎস্যাগারেও এদের পালন করা হয়।

বিজ্ঞানের প্রশ্নোত্তর

অমিতানন্দ দাশ

২৮০৪ সন্দীপ সেনগুপ্ত : আণবিক বোমার সঙ্গে আণবিক রিয়াক্টরের তফাৎ কি? আণবিক শক্তি কিভাবে কাজে লাগানো হয়?

উত্তর :—প্রথম কথা হলো যে খুঁটিয়ে দেখলে আণবিক শক্তি, পারমাণবিক বোমা, এ্যাটম বম্ব সব কথাগুলিই ভুল—বলা উচিত নিউক্লিয়ার শক্তি আর নিউক্লিয়ার বোমা।

কারণ পরমাণু বা এ্যাটম হলো যে কোনো বস্তুকে রাসায়নিকভাবে ভেঙ্গে পাওয়া ক্ষুদ্রতম কণা। বিভিন্ন ধরনের পরমাণু হয়, বোধহয় আপাততঃ ১০৫ রকমের—মানে অতি ক্ষুদ্র পরিমাণে নতুন নতুন কৃত্রিমমৌলিক পদার্থ যেমন ধড়াধ্বড় আবিষ্কার হয়ে চলেছে তাতে সঠিক হিসাব রাখা একটু মুস্কিল। আর অণু তো হলো আরো বড় কণা—পরমাণুগুলি সাধারণতঃ যে ভাবে জোট বেঁধে থাকে—কার্বন হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পরমাণু জুড়ে ভিনিগার হতে পারে, (ঘর ধোয়ার) ফিনাইল হতে পারে, আবার চিনিও হতে পারে। বলতে কি কয়লা পুড়িয়ে কার্বনের অণুকে কার্বন-ডাই-অক্সাইডে রূপান্তরিত করে রাসায়নিক উপায়ে যে তাপ পাওয়া যায় তাকেই বলা যেতে পারে আণবিক শক্তি! (পরীক্ষায় তা লিখো না অবশ্য!)

মানুষ প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে আন্দাজ করে এসেছে অণু-পরমাণুর অস্তিত্বের কথা, কিন্তু একশো বছর আগেও পরমাণুর ভিতরে যে আরো কিছু থাকতে পারে তা ছিল মানুষের কল্পনার বাইরে। তবে এখন জানা গেছে যে যে কোনো পরমাণুর কেন্দ্রে আছে অতি ক্ষুদ্র কিন্তু অত্যন্ত ভারি নিউক্লিয়াস (nucleus)—যার চারদিকে চক্কর মারছে ইলেকট্রনের ঝাঁক। ভারি মৌলিক পদার্থগুলির পরমাণুর নিউক্লিয়াসও বেশী ভারি এবং তার চারদিকে ঘোরা ইলেকট্রনের সংখ্যাও বেশী। লোহার পরমাণুর নিউক্লিয়াসের ওজন সবচেয়ে হালকা হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াসের ওজনের প্রায় পঞ্চাশগুণ। লোহার চেয়ে ভারি পরমাণুগুলির নিউক্লিয়াসকে যথেষ্ট জোরে ঠিকভাবে ধাক্কা মারতে পারলে সেগুলিকে প্রায় সমান দুটি ছোট নিউক্লিয়াসে ভেঙ্গে ফেলা সম্ভব একে বলে ফিশন (fission) প্রণালী। নিউক্লিয়ার শক্তির প্রধান উৎস ইউরেনিয়াম-২৩৫এর নিউক্লিয়াসকে ফিশন প্রক্রিয়ায় ভাঙ্গা যায় সহজে এবং তার ফলে প্রচুর পরিমাণে তাপশক্তি পাওয়া যায়।

নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকে প্রোটন ও নিউট্রন কণা এবং নিউক্লিয়াসের ফিশন ঘটানো হয় সাধারণতঃ তাকে একটি নিউট্রন দিয়ে আঘাত করে। একটি পদার্থ নিউক্লিয়ার জ্বালানী হিসাবে উপযোগী হতে গেলে আরো দরকার যে তার একটি নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে দুটি ছোট নিউক্লিয়াস ছাড়া আরো কয়েকটি ছুটকো নিউট্রন বেরিয়ে আসবে, যার সাহায্যে আরো কয়েকটি জ্বালানী নিউক্লিয়াসের ফিশন ঘটানো সম্ভব হবে।

এইরকম চেইন রিয়াক্‌শনের (chain reaction) ফলে কিছু পরিমাণ নিউক্লিয়ার জ্বালানীর মধ্যে অল্প কয়েকটি নিউট্রন ছেড়ে দিলেই, নিউট্রনগুলি ক্রমান্বয়ে বংশবৃদ্ধি করে এক সেকেণ্ডের এক ক্ষুদ্র অংশের মধ্যেই সবকটি নিউক্লিয়াস ভেঙ্গে বিপুল পরিমাণে তাপ উৎপন্ন করবে। নিউক্লিয়ার 'আণবিক' বোমা এইভাবেই কাজ করে।

নিউক্লিয়ার রিয়াক্টর কতকটা 'পোষমানা বোমার' মত। একটি ইউরেনিয়াম—২৩৫ নিউক্লিয়াসের ফিশনের ফলে গড়ে প্রায় তিনটি ছুটকো নিউট্রন বেরোয়। বোমায় এক সেকেণ্ডের এক ভগ্নাংশের ভিতর সব জ্বালানী নিউক্লিয়াসের ফিশন ঘটা দরকার, কিন্তু রিয়াক্টরে তা ঘটবে হয়তো এক বছর ধরে, যাতে নিউক্লিয়ার প্রক্রিয়ার উদ্ভূত তাপ হঠাৎ এক বোমার অগ্নিপিণ্ড সৃষ্টি না করে আস্তে আস্তে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে লাগতে পারে। রিয়াক্টরে চেইন রিয়াকশনকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় বাড়তি নিউট্রন শুষে নেবার ব্যবস্থা রেখে। ঠিক সেই পরিমাণ নিউট্রন সরিয়ে ফেলা হয় যাতে একটি ফিশনে বেরিয়ে আসা নিউট্রনগুলির মধ্যে গড়ে ঠিক একটিই ফিশন ঘটাতে পারে। এর ফলে প্রতি সেকেণ্ডে যে সংখ্যায় ফিশন ঘটে তা অপরিবর্তিত থাকে এবং ক্রমান্বয়ে সমপরিমাণে তাপ নিস্কৃত হয় ও বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন সম্ভব হয়।

তারপর তাপ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রণালী সব থার্মাল পাওয়ার স্টেশনেই (thermal power station) মোটামুটি একই রকম—তা সেই তাপ কয়লা থেকেই উৎপন্ন হোক কি ইউরেনিয়ামের নিউক্লিয়াস ভেঙ্গেই পাওয়া যাক। সর্বক্ষেত্রেই তাপের সাহায্যে জল বাষ্পীভূত করে তা দিয়ে স্টিম টারবাইন (steam turbine) ঘুরিয়ে, টারবাইনের সঙ্গে জোড়া জেনারেটর (generatar) থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হয়। এই টারবাইন ও জেনারেটরের কিছুটা সাদৃশ্য আছে সাধারণ বৈদ্যুতিক পাখার যথাক্রমে পাখার ব্লেড ও মোটরের সঙ্গে। পাখার বৈদ্যুতিক মোটর বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে পাখার ব্লেডগুলির ঘোরার শক্তি দেয়, আর বৈদ্যুতিক মোটরেরই জাতভাই জেনারেটরের কাজ ঠিক তার উল্টো—তার সাহায্যে পাখা ঘোরার শক্তিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে পরিণত করা সম্ভব। ধর একটা বৈদ্যুতিক পাখার মোটরের বদলে এক জেনারেটর লাগানো আছে, এখন জোর হাওয়া দিলে যদি এই পাখাটি ঘুরতে শুরু করে তবে ওই জেনারেটর থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হবে। টারবাইন ও জেনারেটরের কাজ আর ঠিক বৈদ্যুতিক পাখার কাজের উল্টো—বাষ্পের চাপে ফ্যানের জাতীয় টারবাইনটা ঘুরতে থাকে, আর একই ডাণ্ডার ওপর লাগানো জেনারেটর বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করে। অবশ্য একটি বৈদ্যুতিক পাখার ওজন যেখানে হয়তো দশ কিলো, সেখানে একটি বড়সড়ো টারবাইন জেনারেটর সেটের ওজন তার এক লক্ষগুণেরও বেশী হতে পারে।

ভারতে নিউক্লিয়ার শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রয়োজন খুব বেশী। কারণ প্রথমতঃ ভারতে খুব বেশী কয়লা পাওয়া যায় না, আবার দিল্লী-বোম্বাই অঞ্চলে তো একেবারেই না; তার উপর আবার অন্ততঃ রাশিয়া ও চীনের তুলনায় ভারতে ভালো জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করার মতো বরফগলা নদীর সংখ্যা বেশ কম। বম্বের কাছে তারাপুরে ভারতের প্রথম নিউক্লিয়ার পাওয়ার স্টেশন চালু হয়েছে।

আরো দুটি তৈরী হচ্ছে রাজস্থানে কোটার কাছে আর মাদ্রাজের কাছে কালকাপ্পমে। এছাড়া নিউ-ক্লিয়ার শক্তির আরো উন্নততর ব্যবহারের জন্য চাই গবেষণা-বিষয়ক নিউক্লিয়ার রিয়াক্টর। আলকাপ্পমে এক নতুন গবেষাণাগারে তৈরী হচ্ছে আরো দুটি। দিল্লী আই. আই. টি তে নিউক্লিয়ার এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে—সেখানেও থাকবে একটি ছোটখাটো গবেষণা রিয়াক্টর।

ফিশন ছাড়া নিউক্লিয়ার শক্তির আর এক উৎস হলো ফুশন (fusion)—যে প্রক্রিয়াতে দুটি ছোট নিউক্লিয়াস খুব উঁচু তাপমাত্রায় জোড়া লেগে একটি অপেক্ষাকৃত বড় নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি করে এবং প্রচুর তাপশক্তি উৎপন্ন করে। হাইড্রোজেন বোমা এইভাবেই কাজ করে, আবার সূর্য থেকে আমরা আলো, তাপ যা কিছু পাই সে সবের এইভাবেই উৎপত্তি হয়—সূর্যকেও বলা যেতে পারে একটি বিশাল ফুশন বোমার অগ্নিগোলক, আবার বোমার অগ্নিগোলক যেখানে জ্বলে থাকে কয়েক সেকেণ্ড মাত্র সেখানে সূর্য জ্বলে আছে কয়েকশো কোটি বছর।

হাইড্রোজেন বোমাতে একটি ফিশন (বা 'আণবিক') বোমা ফাটিয়ে প্রায় এক কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা সৃষ্টি করে বোমার ভিতরে রাখা ভারী হাইড্রোজেন পরমাণুর নিউক্লিয়াসগুলিকে ফুশন প্রক্রিয়ায় হিলিয়াম নিউক্লিয়াসে পরিবর্তন করে প্রচুর তাপশক্তি পাওয়া যায়।

সাধারণ জলের মধ্যে হাইড্রোজেন পরমাণুর কিছু অংশ ভারী হাইড্রোজেন পরমাণু, যার ওজন সাধারণ হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রায় ডবল। যদি এই ভারী হাইড্রোজেনের ফুশন থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হয় তবে সভ্যতার এক বিরাট অগ্রগতি হবে, কারণ তখন সমুদ্রের জল থেকে প্রায় বিনা পয়সাতেই ভারী হাইড্রোজেন জ্বালানী পাওয়া যাবে—যার যত চাই। আর কয়লা খনির দরকার পড়বে না, ইউরেনিয়াম খনিরও না। তবে বাদ সাধছে ওই এক কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। পাওয়ার স্টেশনে ক্রমান্বয়ে এক কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা রেখে ফুশন ঘটানো নিঃসন্দেহে খুবই কঠিন কাজ। কিন্তু বিভিন্ন দেশে হাজার হাজার বৈজ্ঞানিক এই সমস্যার সমাধান করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। আশা করা যাচ্ছে ১৯৯০ নাগাদই ফুশন প্রক্রিয়া চালিত প্রথম পাওয়ার স্টেশন চালু করা সম্ভব হবে।

ডিকি

স্মরজিৎ চৌধুরী

বয়স—৫ বছর ৪ মাস গ্রাহক সংখ্যা—২৬০৯

আমার কুকুরের নাম ডিকি। বয়স ছয়। দুধ রুটি মাংস খায়। ভীষণ রাগী। আমি সামলাই বাবাকে ভয় পায়। মাকে মানে না।

মিমি তার বাচ্চারা

সুবীর ঘোষ

বয়স—৭ বছর ৫ মাস গ্রাহক সংখ্যা—১২৯২

একদিন আমরা দেখলাম একটা রোগা কুকুর আমাদের বাড়ির সিঁড়িতে বসে আছে। মা কুকুরটাকে তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন, বাবা বললেন, 'থাক। এখানে কুকুরটা মরে যেতে পারে'। পরে দেখলাম পাপড়িদিরা কুকুরটাকে খাবার দেয়।

তারপর আস্তে আস্তে কুকুরটা বড় হয়ে গেল! একদিন পাপড়িদিরা বিদেশে চলে গেল। আমরা তখন কুকুরটাকে খাবার দিতাম। তারপর কুকুরটা আমাদের পোষা হয়ে গেল। আবার পাপড়িদিরা ফিরে এল, তারপর আমরা আর পাপড়িদিরা কুকুরটাকে খাবার দিতাম। আমরা কুকুরটার নাম দিলাম মিমি, আর ওর ল্যাজের নাম সুবর্ণলতা। গতকাল কুকুরটার আটটা বাচ্চা হয়েছে। একটা ধপধপে সাদা বাচ্চা মরে গেছে। আমরা একটা সাদা কালো রঙের বাচ্চা পুষবো। গতকাল পিতুদিরা না জেনে ওই বাচ্চাগুলোর ওপর জল ফেলে দিয়েছিল, আমি তখন অঙ্ক করছিলাম। মিমি খালি কুঁই-কুঁই করছিল। আমি তখন ছুটে দেখতে গেলাম। গিয়ে দেখি মিমি খালি কি জিনিস শুঁকছে

আর কুঁই-কুঁই করছে। প্রসুন-কাকু দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হয়েছে ?' উনি বললেন। 'পিতুদিরা না জেনে জল ফেলে দিয়েছে'॥ তারপর দেখলাম বাচ্ছাগুলো চুপ-চুপে ভিজে হয়ে গেছে আর মিমি খালি কুঁই-কুঁই করছে। প্রসুনকাকু আর মা বাচ্ছাগুলোকে রোদে ছেড়ে দিলেন। তারপর সন্ধেবেলা আবার বাচ্ছাগুলোকে তুলে দিলাম যেখানে ছিল। রোজ ভাবছি বাচ্ছাগুলোর চোখ ফুটবে, কিন্তু এখনও তো কই ফোটেনি। হঠাৎ একদিন দেখি বাচ্ছাগুলো একটু তাকাচ্ছে।

ধাঁধা*

মহাশ্বেতা গঙ্গোপাধ্যায়

গ্রাহক নং ১৪০১—বয়স ৮ বৎসর ২ মাস

ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা (বিদ্যাসাগর) অনূদিত 'বেতাল পঞ্চবিংশতি'র কোন এক কাহিনী থেকে—বজ্রমুকুট নামে এক রাজপুত্রের সঙ্গে এক সরোবরের তীরে কোন এক রাজকন্যার দেখা। কিন্তু রাজপুত্রের পক্ষে রাজকন্যার নাম জিজ্ঞাসা করা সম্ভব ছিল না। রাজকন্যাও মুখে নিজের পরিচয় না দিয়ে একটি সঙ্কেতে পরিচয় দিয়েছিল। কাহিনীতে এইভাবে সঙ্কেতটি ছিল :—'রাজকুমারী শিরঃস্থিত পদ্ম হস্তে লইলেন। অনন্তর কর্ণসংযুক্ত করিয়া দন্তদ্বারা ছেদনপূর্বক পদতলে নিক্ষিপ্ত করিলেন…।'

এই সঙ্কেত থেকে রাজকন্যার নাম ও পরিচয় কি করে জানা যাবে ?

উদয়ন মুখোপাধ্যায়

বয়স—১১ বৎসর ২½ মাস—গ্রাহক নং—২২৫৭

(১) এমন একটি তিন অক্ষরের শব্দ বার কর—যার বাংলা এবং ইংরাজী দুটিই সোজা দিক থেকে পড়লেও যা হয়, উল্টো দিক থেকে পড়লেও তাই হয়।

(২) এমন একটি দ্বীপের নাম বল যার প্রথম অক্ষর ছাড়লে 'শেষ' বুঝায়, মাঝের অক্ষর ছাড়লে একটি 'চতুষ্পদ জন্তুর' নাম হয় এবং শেষের অক্ষর ছাড়লে 'অবসাদ জনিত বিশেষ শারীরিক প্রকাশ' বুঝায়।

"পাখির স্বপ্ন"

মধুমিতা দাস

বয়স ১১ বরছ গ্রাহক সংখ্যা ২৯৭

ছোট্ট পাখি যাবে বহু দূরে,
রূপকথার ঐ স্বর্ণপাহাড় চূড়ে।
নয়বা সুদূর দেশে রাজপুত্তুর বেশে
স্বপ্নমাখা কোন্ সে অচিন পুরে॥

সেথায় আছে ফুলপরী আর জলপরীদের মেলা,
তাদের সাথে মনের সুখে করবে অনেক খেলা।
সবুজ নরম ঘাসে মুক্তো শিশির হাসে,
রঙবেরঙের ফুলের মাঝে কাটবে সারা বেলা॥

* হাতপাকাবার আসরের শেষ পৃষ্ঠা দেখ।

মজার ব্যাপার

মিলিন্দ চক্রবর্তী
বয়স ৬ বৎসর ১১ মাস
গ্রাহক নং ২০৬৬

কলেজের হচ্ছে যে স্পোর্টস্,
দেখছি বসে বাবার পাশে,
হঠাৎ একটা পাগলী দেখি
আমার দিকে দৌড়ে আসে।
বললে এসে হাতটি, ধরে,
'এই তো আমার ছেলে,
এমন ভাবে কে গিয়েছে
এইখানেতে ফেলে।'
আমি তখন বাবাকে ধরি
বেজায় ভয় পেয়ে।
পরে শুনি পাগলী নয় সে,
ঐ কলেজের মেয়ে।
ছদ্মবেশের খেলাতে সে
পাগলী সেজেছে,
শেষে দেখি ফার্স্ট প্রাইজটা
সেইই পেয়েছে !!

প্রজাপতি

শৃণ্বন্তী পাল
গ্রাহক নং—১৬৫৫ বয়স—১০

প্রজাপতি উড়ে চলে কতদূর কতদূর
বাতাস বইছে আজ ফুরফুর, ফুরফুর।
গায়ে সে মেখেছে আজ মিঠে সোনা রোদ্দূর
ডানায় ডানায় তার ফুর্তিটা ভরপুর
প্রজাপতি উড়ে চলে কতদূর কতদূর ॥
প্রজাপতি মেলে দিয়ে চঞ্চল পাখ্‌না
ওড়ে প্রান্তর জুড়ে চেয়ে চেয়ে ছাখ্‌না,
সবুজ মাঠের মাঝে দেখতে কি অদ্ভুত,
এল পৃথিবীর বুকে বুঝি কোনো নবদূত

ছয় ঋতুর ছড়া

উত্তমকুমার বটব্যাল
গ্রাহক নং—১৪৮১
বয়স ১২ বছর

গ্রীষ্মেতে চারিদিক রোদ্দর ধুধু,
বর্ষায় শুরু হয় রিমিঝিমি শুধু।
শরতে প্রকৃতি আনে শ্যামলডালি।
হেমন্ত শিশিরকণা প্রাতে দেয় ঢালি।
শীতকালে কাঁপে সবে শীতের ভয়ে,
বসন্তে বনরাজি ভরে কিশলয়ে।

'রাতের রেলগাড়ী'

অনিতা চট্টোপাধ্যায়

বয়স—১৩, গ্রাহক নং—২৫৭৮

ট্রেন চলে ঝম্‌ঝম্, রাত্রি গভীর।
ছুঁয়ে যায় মাঠ, বন, গ্রাম, নদীতীর।
উপরে আকাশ তার কালো কালিমাখা,
তারি কোণে নিশাচর পাখি মেলে পাখা।
শন্ শন্ রব ওঠে তালের পাতায়—
চাঁদের মলিন মুখ বনের মাথায়।
ট্রেম চলে একলাই, শোনো দিয়ে মন—
ঝন্‌ঝন্ ধ্বনি ওই তারি ক্রন্দন।
লাইনের শৃঙ্খল বাঁধা তার পায়,
পথে পথে ঘুরে সেই ব্যথা বয়ে যায়।
জীবনটা বাঁধা তার লাইনের পথে।
ক্লান্ত চরণ, তবু চলে কোনোমতে।
ঝন্‌ঝন্ ডাক ছেড়ে ছোটে রেলগাড়ি—
আরো বহুদূর তাকে—দিতে হবে পাড়ি

ছড়া

শুভব্রত মুখোপাধ্যায়

গ্রাহক সংখ্যা—২৩০৪ বয়স—৯ বছর ৪ মাস

ঝুপঝাপ ঝুপঝাপ জল পড়ে জোরে,
বনবন বনবন রথচাকা ঘোরে।
টিকটিক টিকটিক ঘড়ি চলে ডেকে,
ভোঁ পিপ পিপ মোড়ে গাড়ি যায় হেঁকে।
ঘটাং ঘটাং ঘট ট্রেন ছুটে চলে,
কলকল ছলছল নদী কথা বলে।
ডানা ঝটপট করে পাখি যায় উড়ে,
'গুড়ুম' বোমা ফাটে, যায় সব পুড়ে॥

রবি ঠাকুর

হেদায়তুল্লা

গ্রাহক নং—২৫৬৩ বয়স—১৩ বছর

রবি ঠাকুর, রবি ঠাকুর
কোথায় তোমার ছবি,
অন্ধকারে হারিয়ে গেছি
কোথায় মোদের রবি!
দিনের আলো যুগের আলো
সর্বকালে তাই,
এমনিদিনে আমরা সবে
তোমার যশ গাই।
যুঁই-চামেলি পড়লো খসে
লক্ষ ফুলের হাসি,
চাঁদামামা বলছে হেসে
তোমায় ভালবাসি।
রবি ঠাকুর রবি ঠাকুর
কোন আলোকে ছিলে
ক্ষণেক এলে, ক্ষণেক গেলে
লক্ষ হাসি দিলে।
হৃদয়মাঝে আছ তুমি
আছ শিশু মনে,
তোমার গলায় মালা দিতে
ফুল ফুটেছে বনে।

গাজন

লিপি ঘোষ

গ্রাহক নং—২৩০০ বয়স—১১

বাজনা বাজে শিবতলাতে নাক কুড়া-কুরকুর
গাজন এল বাংলা দেশে তাইতো এত সুর।
সন্ন্যেসীরা পথে পথে গাইছে শিবের গান
উপোস করে ঘুরছে পথে জল না করে পান।
একটি দুটি পয়সা পেয়ে ভরছে আপন থলি।
শিবের নামে করে গান পথে পথে চলি।

চড়ক মেলা

শুভ্রা বিশ্বাস

গ্রাহক নং—২০২৯ বয়স—১৪ বছর

চৈত্রমাসে চড়ক মেলা চড়াক্ চড়াক্ চড়াক্
নবাব দিঘীর ওপারেতে বাজছে মাদল ঢাক,
কতই খেলা সারাবেলা চলছে ছুটোছুটি,
সোনা, বাবুল, বুকান, তপুর আজই স্কুল ছুটি
আজকে তাই বাধা মানে না মায়ের শাসন ধমক
পরাণে ভাই লেগেছে ওদের চড়ক মেলার চমক।

গরম দিনে

স্নিগ্ধা বিশ্বাস

গ্রাহক নং—২০২৯ বয়স—৮

চৈত্রমাসে আঃ কি গরম
ঘরের ভিতর বন্ধ দম!
তবুও পড়া হয় না শেষ
আমার অতি প্রিয় সন্দেশ।

সাইকেল

সঙ্ঘমিত্রা দে চৌধুরী

গ্রাহক সংখ্যা—৭৬৭ বয়স—৯½

ক্রিং ক্রিং বাজে বেল,
ওই চলে সাইকেল।
হ্যাণ্ডেল হাতে ধরি
রায়বাবুদের হরি।
চাকা ঘোরে বন্‌বন্,
গাড়ি চলে সন্‌সন্।
ওরে ভুলো যারে সরে
চাপা পড়লে যাবি মরে।

খাপছাড়া

অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়

বয়স—১২½ বৎসর গ্রাহক সংখ্যা—১৬১৯

নির্জন সমুদ্রতীর—চারিধারে বালু
দাঁড়িয়ে কে যেন একা খাচ্ছে সেদ্ধ আলু!
ফুলের সাথে মৌমাছিদের আড়ি কি হয় কভু?
ত্রৈরাশিক অঙ্কটা মোর মিলছে না তো তবু!
ঘাসের পরে শিশিরবিন্দু মুক্তাসম ঝলমলে,
ফুচকা-আলুকাবলি খেতে সদাই আমার মন বলে!
তারার দলের মাঝে বসে চাঁদেরই দরবার,
পা পিছলে ঠ্যাং ভাঙ্গে—কি বিশ্রী ব্যাপার!
নীল আকাশের মাঝে পাখি কেমন পাখা মেলে—
সাপের পেটে ব্যাঙ ডেকেছে—কেষ্টা সেদিন বলে!
মেঘের খেলা দেখে দেখে মন হল উদাসী,
বলতো ভাই কেমন লাগে শুনতে ঘোড়ার হাসি!
কোথায় বল সোনার হরিণ বেড়ায়ে হেথা-হোথা?
রাম-ছাগলে করলে তাড়া পালাই বল কোথা!
ভোরের পাখির সুরের মোহে সূর্য কি দেয় দেখা?
একটু বরং নিই ঘুমিয়ে থাক্ কবিতা লেখা!

সব থেকে ভাল

তানিয়া দাশ

বয়স—১০ বৎসর ১১ মাস গ্রাহক নং—১৯২৩

সন্দেশ খেতে ভাল আর ভাল দই,
এ সবের থেকে ভাল। 'সন্দেশ' বই
প্রতি পাতা গল্পে ও ছবিতে ভরা,
শিশুমন সেইখানে দেয় যে ধরা
জানবার কথা আর ছড়া যে প্রচুর,
হাসি ও আনন্দেতে মন ভরপুর।
প্রতি মাসে একখানি 'সন্দেশ' চাই
'সম্পাদক সন্দেশ' প্রণাম জানাই।

আবু-বেন্‌-আদেম

অলকনন্দা চট্টোপাধ্যায়

বয়স—১৩ বৎসর ৯ মাস গ্রাহিকা সংখ্যা—১৪৫৮

আবু-বেন্‌ আদেম (তাঁর বংশ বিশাল হোক)
একদা রাত্রে তন্দ্রা হইতে মেলিলেন ছুই চোখ।
ঘরভরা সেই চাঁদের আলোয় দেখিলেন তিনি চাহিয়া,
দেবদূত এক স্বর্ণপুঁথিতে চলেছেন কিছু লিখিয়া।
জিজ্ঞাসিলেন আবু তাঁরে, 'প্রভু, কহ মোরে দয়া করে,
স্বর্ণপুঁথিতে কি লিখিছ তুমি শ্রবণ করাও মোরে।'
দেবদূত ধীরে তুলিয়া মস্তক কহেন গভীর স্বরে,
'লিখি তাঁহাদের নাম যাঁদের প্রীতি আছে ঈশ্বরে।'
আবু শুধালেন, 'ভগবন্‌, মোর নাম কি হোথায় আছে ?'
দূত কহিলেন, 'না বৎস, তব নাম আসেনি আমার কাছে।'
বলিলেন আবু নামাইয়া স্বর, 'এই কথা লেখ তবে,
ভালোবাসি আমার মানুষ ভাইদের যত আছে ভবে।'
নাম লিখে নিয়ে দেবদূত ফিরে গেলেন নিজ কাজে।
পর রাত্রিতে তাঁহার মুরতি আবুর ঘরেতে রাজে।
দূতের তালিকা দেখিয়া সবার বিস্ময় মানিতে হয় ;
'ভগবানের প্রিয়' হিসাবে আদেম সবার উপরে রয়।**

Leigh Hunt রচিত—'ABOU-BEN-ADHEM' কবিতার অনুবাদ।

স্বপনের দেশে

জয়ন্তী রায় চৌধুরী

বয়স—৯ বছর ৩ মাস গ্রাহক নং—১৩৬৫

জান সেদিন আমার ঘরে
মধু বাতাসে ভর করে
ঢুকল ছোট্ট এক পরী—
গায়ে চাঁপার সুগন্ধ
তার মনে কি আনন্দ
পরনেতে দেখি রাঙা শাড়ী—
সেতো থাকে বুঝি আকাশেতে
তার চাঁপাফুলী ওড়নাতে
আকাশের তারা বুঝি জ্বলে—
ওই আকাশের চাঁদ বুঝি
আজ ঘোরে শুধু পথ খুঁজি
মেঘের মতন তার চুলে
একি ভোর হয়ে এল যেই
দেখি রাঙা পরী আর নেই
জোনাকী হয়ে সে উড়ে যায়—
আমি কোনখানে নাহি জানি
উড়ে চলে জোনাকীর রাণী
কোথা নীল গগনের গায়—!

শমীন্দ্র পাঠাগার

নন্দিতা সেনগুপ্ত বয়স ১২, গ্রাহক নং ২০৭১

শান্তিনিকেতনে আমাদের পাঠভবনের একটি পাঠাগার আছে, তার নাম শমীন্দ্র পাঠাগার, ওখানে দেশবিদেশের নানারকম সুন্দর সুন্দর বই আছে। আমাদের যখন ছুটি থাকে তখন আমরা ওই পাঠাগারে পড়তে যাই।

কয়েক বছর আগে এই পাঠাগারটি হয়েছে, আমি প্রথমে বুঝতেই পারিনি যে এটি একটি পাঠাগার, দেখতাম অনেকে ওখানে ঢুকে কি যেন করে, আমি রোজই ভাবতাম ওখানে ঢুকবো। কিন্তু ঢোকা আর হত না, খুব ভয় করত।

একদিন সাহস করে ঢুকলাম, ঢুকেই মন আনন্দে ভরে উঠল, দেখি তাকে তাকে বই সাজানো। তখনই আমি গল্পের বই পড়তে আরম্ভ করে দিলাম। তারপর থেকে যখনই ছুটি পাই তখনই বই পড়ি।

একদিন লক্ষ্য করলাম দুটি বিরাট বিরাট আলমারি। একজনকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম এই দুটি আলমারির মধ্যে একটি আলমারি বৌঠান (প্রতিমাদেবী) এই পাঠাগারকে উপহার দিয়েছেন।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে গুরুদেবের ছোটছেলে শমীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বারো বছর বয়সে মুঙ্গেরে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান, তাঁরই স্মৃতিতে এই পাঠাগারটির নাম 'শমীন্দ্র পাঠাগার হয়েছে। এই পাঠাগারটি আমাদের কাছে, বিশেষ করে আমার কাছে খুবই আকর্ষণীয় স্থান।

আমার চাঁদ যাত্রা

নূপুর ভট্টাচার্য

বয়স ৯ বছর গ্রাহক সংখ্যা ১৮৫১

আমেরিকার তিনজন আকাশচারী নাকি চাঁদের উদ্দেশ্যে অভিযান করেছে। চারি দিকে হৈ হৈ পড়ে গেছে। আমি কেবল শুনছি আর অবাক হয়ে ভাবছি যে কি করে এসব সম্ভব, মা বললেন আজ রাত্রিতেই নাকি আমেরিকার আকাশচারীরা চাঁদে অবতরণ করবেন, মা বাবারা সারারাত ধরে রেডিওতে কমেনটারি শুনতে লাগলেন।

আমি রূপকথার চাঁদের কথা ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল আমি চেয়ে দেখি যে কে আমার খাটটা বাইরে টেনে এনেছে। চোখ রগড়ে ভাল করে চেয়ে দেখি যে আমার সামনেই একটা বিরাট বড় রথ তাতে একটা মানুষ চড়তে পারে। আমার বড় ইচ্ছে হচ্ছিল যে আমি রথটায় চড়ি, হঠাৎ পায়ের শব্দে চমকে উঠে দেখি একটি পরী, তার হাতে সোনার দণ্ড, সে আমায় দণ্ড দিয়ে ইঙ্গিত করলে রথে চড়তে। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত রথে চড়লাম, পরীটিও আমার সঙ্গে রথে চড়ল।

রথটা খুব জোরে উপরে উঠতে লাগল। তারায় ছাওয়া আকাশ ক্রমে আমার কাছে আসতে লাগল। মনে হচ্ছিল আমি যেন হাত দিয়ে তারাগুলি ধরতে পারি, কিন্তু তা পারছিলাম না।

চারিদিকে কি অপরূপ দৃশ্য তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। কিছু পরে রথটা চাঁদে এসে পৌঁছল, পরী আমাকে অদ্ভুত রকম পোষাক পরিয়ে দিয়ে নিচে নামতে বললে, আমি নিচে নামলাম। চারি দিকে কেমন ছায়া ছায়া অন্ধকার কোথায় পা ফেলছি কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে বিরাট গর্ত, আমি নিচু হয়ে চাঁদের পাথর কুড়িয়ে নিলাম। তার রঙটা অনেকটা কাঠকয়লার মতো। হঠাৎ আমি কি ভেবে উপরের দিকে তাকালাম কোথায় বা পরী কোথায় বা রথ, কিছুই দেখতে পেলাম না, ভয়ে আমি কাঁপতে লাগলাম।

হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। চেয়ে দেখি সকাল হয়েছে।

মা বললেন যে পৃথিবীর মানুষ চাঁদে নেমে গেছে, আমি অবাক হয়ে আমার স্বপ্নের কথা ভাবতে লাগলাম।

বিচিত্র রাত

অম্লান ভট্টাচার্য—বয়স ১০, গ্রাঃ নং ২১৭০

রাত বারোটাও হতে পারে, ঘুমোচ্ছিলাম প্রাণ ভরে। কিন্তু, কড়ানাড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। এত রাতে আবার বিরক্ত করে কে! আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কেহে তুমি এত রাতে বিরক্ত করছ।'

বাইরে থেকে উত্তর এল 'আমি চোর দরজা খোল।' আমি অবাক হলাম। কোন চোর বাড়ির মালিককে এভাবে ডাকে কিনা তা আমার জানা নেই। আমি প্রশ্ন করলাম 'কি করতে এসেছ?' এবার বাইরে থেকে রাগান্বিত গলা শোনা গেল 'কেনরে মুখ্যু, রাতদুপুরে চোর কি ঘাস খেতে আসবে, দরজা খোল' আমি ভাবলাম একী আপদ!

তবুও বিছানা থেকে উঠে দরজা খুলে দিতেই—আমি ভীষণ আশ্চর্য হলাম, আর কেই বা আশ্চর্য বোধ না করবে, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন পাঞ্জাবীধুতি পরা এক ভদ্রলোক। তাঁর সারা শরীর থেকে আতরের গন্ধ বেরুচ্ছে। আমি ধন্য হলাম এমন চোরের দর্শন পেয়ে। চোর মহারাজ আমার পাশ কাটিয়ে ভিতরে ঢুকলেন।

তারপর আমার নতুন কেনা ইজি চেয়ারটার ওপর শুয়ে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'টাকার থলি-টলি নিয়ে এস', আমার চোখ কপালে উঠে গেছে। একটু দেরী হতেই অবোর হুংকার ছাড়লেন, শিগগির নিয়ে এস নাহলে—

কিন্তু কিন্তু করে টাকার থলি আনতে হল। নাহলে তিনি কি করবেন, কে জানে? ড্রেসিং টেবিলটা নিয়ে এস, আবার হুংকার ছাড়লেন তিনি। আর দেখ আয়নাটাও আনতে ভুলো না। সব টানাটানি করে নিয়ে আসার পর তিনি হুকুম করলেন, একটা রিক্সা ডেকে নিয়ে আয়। খালি পায় যেতে হল। কারণ, জুতোটাও তিনি দখল করেছেন। ১০ মিনিট পরে গালাগালিসহ রিক্সাওলা আর রিক্সাকে নিয়ে এলাম। ঘরে ঢুকে দেখি তিনি ধূমপান করছেন, তামাকের সুবাসে আমার ঘর ভরপুর। আমাকে তিনি উঠে বললেন, জিনিসপত্র সব নিয়ে আয় বলে তিনি রিক্সায় চেপে বসলেন। আমাকে ঘাড়ে করে সব কিছু রিক্সায় তুলে দিতে হল। বাড়িতে ঢোকার সময় শুনলাম, চোর মহারাজ বলছেন রিক্সাওলাকে, ফিরে এসে এর কাছ থেকে রিক্সার ভাড়াটা নিয়ে নিও বুঝলে?

হারান বন্ধু

সৌমিত্র মুখোপাধ্যায়

বয়স ১০ বছর গ্রাহক নং ২৭৭০

আমার বাড়ির সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড নিমগাছ আছে। ঐ গাছে বাসা করে থাকত দুটি শালিক পাখি আর তাদের দুটি বাচ্চা। তাদের কিচির মিচির শব্দ শুনলে আমার মনে আনন্দ ভরে উঠত। ইচ্ছা হত ছোট্ট পরিবারের সঙ্গে আমিও তাদের একজন বন্ধু হয়ে খেলা করি। খুব ভাল লাগত তাদের।

আমি আর আমার ভাই প্রতিদিন খোলা জানালার ধারে বসে একদৃষ্টে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকতাম আর বেশ আনন্দ পেতাম। যত দিন যায় পাখিগুলিকে আমি ততোই ভালোবেসে ফেললাম। দিনে অন্তত একবার না দেখলে মন খারাপ হয়ে যেত। আমায় ছোট ভাই ওদের বন্ধু বলে ডাকত।

ইস্কুলে যাবার সময় এবং ফিরে এসে তাদের একবার দেখতেই হত। যত দেখতাম ততই ভাল লাগত।

তারপর একদিন বাবা আমাদের নিয়ে একটা স্কুলে ভর্তি করে দিলেন! সেখানে গিয়ে আমি অনেক বন্ধু পেলাম বটে কিন্তু মনটা ঐ শালিক পাখির কাছেই পড়ে থাকত। ক্লাসে আসার আগে একবার তাদের দেখে আসতাম কিন্তু বাড়ি ফিরে সন্ধ্যার সময় আর তাদের দেখতে পেতাম না।

এইভাবে দিনকয়েক কাটার পর গত কয়েকদিন ভীষণ বৃষ্টি পড়ে সব গোলমাল হয়ে গেল। রাস্তাঘাট জলে ডুবে গেল। বাড়ির দরজা বন্ধ থাকত পাখিগুলোর জন্য আমাদের মন বড় খারাপ হয়ে গেল। কেবলি মনে হত তারা কি করছে কোথায় আছে।

চুপি চুপি জানলা খুলে দেখতে চেষ্টা করলে মা বকে উঠতেন। বৃষ্টি থামতেই ছোট ভাই বলল 'চল্ দাদাভাই পাখিদের দেখে আসি।'

সেখানে গিয়ে দেখি বাচ্চা দুটি মাটিতে পড়ে আছে। তাদের মা, বাবা পাশেই ছটফট করছে আর কিচ্‌মিচ্ করছে কিন্তু এই কিচ্‌মিচ্ শব্দের মধ্যে আছে তাদের কাতর আর্তনাদ।

ছুটে গিয়ে দাঁড়াতেই বাচ্চাদের মা বাবা একবার আমাদের পায়ের ওপর পড়ে ঠোকরাতে লাগল, আর একবার বাচ্চাদের কাছে ফিরে যেতে লাগল। এইভাবে তারা তাদের বাচ্চা দুটিকে বাসায় ফিরিয়ে দেবার জন্য আমাদের জানাল।

আমাদের মনে বড় দুঃখ হল। চিন্তা করতে লাগলাম কেমন করে আমরা নিমগাছে উঠব, আমরা তো ছোট।

এই দৃশ্য দেখতে অনেক লোক জড় হয়েছিল। তার মধ্যে একটি বড় ছেলে একবার আমাদের দিকে তাকিয়ে বাচ্চা দুটিকে নিম গাছের বাসায় রেখে এল। মা ও বাবা তাদের কাছে ফিরে গেল। কিন্তু পরের দিন গিয়ে দেখি তারা আর সেখানে নেই। নিমগাছ ফাঁকা।

মনে হলো যেন আমাদের মতো নিম গাছেরও খুব কষ্ট হচ্ছে।

ধাঁধার উত্তর

মহাশ্বেতা গঙ্গোপাধ্যায়

রাজকুমারী পদ্মপুষ্প মস্তক হইতে নামাইয়া কর্ণে সংযুক্ত করিয়াছিল—ইহার অর্থ 'আমি কর্ণাট-নগর-নিবাসী।' দন্ত দ্বারা ছেদন করা—ইহার অর্থ 'আমি দন্তবাট রাজার কন্যা।' পদ্ম পদতলে নিক্ষিপ্ত করিলেন—ইহার অর্থ 'আমার নাম পদ্মাবতী।'

উদয়ন মুখোপাধ্যায়

(১) নয়ন—eye

(২) হাইতি

? ধাঁধা

ফাল্গুন মাসের ধাঁধার উত্তর:

(১)

বাৎসরিক পরীক্ষায় ২০০র মধ্যে ওরা নম্বর পেয়েছিল :—শীলা—১৪৪, নীলা ও লীলা প্রত্যেকে ১২১ আর ইলা ১১৪। মিলিয়ে দেখ, সব কয়টি সর্তই রক্ষা হয়েছে।

(২)

গড়গড়ি মশাইয়ের মোট লোকসান হয়েছিল ৫০০৲ টাকা প্রথম গাড়িটা ৬০০০৲ টাকায় বিক্রি করে যখন ২০% লাভ হয়েছিল, সেটা কেনা হয়েছিল নিশ্চয় ৫০০০৲ টাকায়। দ্বিতীয় গাড়িতে। ৬০০০৲ টাকা বিক্রয়মূল্যে ২০% লোকসান হল মানে সেটার ক্রয়মূল্য ছিল ৭৫০০৲ টাকা। সুতরাং মোট ১২৫০০৲ টাকার দুটো গাড়ি কিনে গোবর গণেশ গড়গড়ি বিক্রি করলেন ১২,০০০৲ টাকায়। লোকসান হল মোট ক্রয়মূল্যের ৪%। গোবর গণেশ আর কাকে বলে !!

(৩)

মজার **সন্দেশ** শোন হে **সন্দেশ** ভাই,
ভোজ রাজে রোজ **ভোজ** খাওয়ায় সবাই !
আহারে বসিয়া সুখ **আহারে** কি তাঁর,
সারা **মাস** মাছ-**মাস** পোলাও আহার !
ঘীয়ে **চপ** চপ ফ্রাই, **চপ,** কাটলেট।
ভেটকি, ইলিশ, চিংড়ি আসে রোজ **ভেট**।
সর্ষে **বাটায়** রাঁধা **বাটা** মাছ ঝাল।
রসাল রাবড়ি-মাখা পক্ক **রসাল**।
মন-**মন** ক্ষীর, দৈ যত চায় **মন**।
না মানে **বারণ** যেন মত্ত **বারণ**।

(**সমস্ত সর্ত রক্ষা** করে এবং **ছন্দ-মিল ঠিক রেখে** যারা অন্য শব্দ বসিয়েছে, তাদেরও নম্বর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু **সর্ত-রক্ষা** না হলে ঠিক ধরা হয় নি। অনেকে ভুলে গেছ যে একই শব্দ **একই অর্থে** দুবার ব্যবহার করা চলবে না।)

বিশেষ দ্রষ্টব্য

(১) পৌষমাসের প্রথম ধাঁধার উত্তরে একটু ছাপার ভুল ছিল, "'হ'-এর জায়গায় 'ক' আর 'র'-এর জায়গায় 'ল' বসে'ছিল" হবে।

(২) মাঘ মাসের দ্বিতীয় ধাঁধার উত্তরেও একটু ভুল আছে, দ্বিতীয় বাক্যের প্রথম শব্দটি হবে 'সংবাদ' ('খবর' নয়)। অবশ্য সংবাদের প্রতিশব্দ খবর, কাজেই কেউ খবর লিখলে সেটাও সম্পূর্ণ ভুল নয়।

এই সব ছাপার ভুলের জন্য অবশ্য তোমাদের নম্বর কাটা যায় না, কারণ, ছাপানো উত্তর দেখে ত আর নম্বর দেওয়া হয় না। দেওয়া হয় মূল পাণ্ডুলিপি থেকে।

তবে মাঝে মাঝে তোমরা অন্যমনস্ক হয়ে ভুল লিখে ফেল, যা ভাব তা লেখ না, তখন নম্বর কাটা যায়। তাছাড়া নাম লিখতে ভুলে গেলে, কিম্বা ডাকে উত্তর হারালে ত কথাই নেই!

কি করব বল ? এ সবের উপরে তো আমাদের হাত নেই!

মাঘ মাসের ধাঁধার উত্তর-দাতাদের নাম

যাদের সব কয়টি উত্তর ঠিক :—

৫৭ শাশ্বতী দত্ত, ১৮১ মিষ্টি ও বাসবেন্দু গুপ্ত, ১৯২ অন্তরা ও ফুল্লরা সেন, ২৮৪ নূপুর ও মিঠু দাশগুপ্ত, ৬১৬ ভারতী মিত্র, ১০৮৬ রণেন নাগ ও সোমনাথ দাশগুপ্ত, ১২৩৪ অনিন্দিতা সরকার, ১২৯৮ রুদ্রনাথ ঘোষ দস্তিদার, ১৬৯৩ শ্যামল কুমার পাইন, ১৯৩৮ লীনা মিত্র, ২২১৫ শুভা মজুমদার, ২২৫৭ উদয়ন মুখোপাধ্যায়, ২৩৫৫ সুচরিতা রায়, ২৪৬৭ মহাশ্বেতা ও অমিতবিক্রম ঘোষ, ২৭১৩ সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৮১৬ তপতী দাশগুপ্ত।

দুটো ঠিক ও একটা প্রায় ঠিক :—

৩২১ অজন্তা ও বন্দিতা ঘোষ, ১৩২০ বিজলী ঘোষ, ১৪৬০ কেয়া বসু, ১৬১৯ অঞ্জন ও অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৬৫৫ শৃন্বন্তী পাল, ১৮৯৪ সুস্মিতা কাঞ্জিলাল, ২০২৯ শুভ্রা বিশ্বাস, ২০৯৩ দেবাশিস দত্ত, ২১৫২ সুরজিৎ, অনুপা ও শিপ্রা কর-পুরকায়স্থ, ২১৫৯ স্বাহা ও শুভঙ্কর বাগচী, ২৩৮২ দীপালী, অনামিকা ও বিদ্যুৎ সাহা, ২৫৪৭ প্রসেনজিৎ মৈত্রেয়ী বসু, ২৬২৯ চিত্রাঙ্গদা ও চৈতালী বসু, ২৬৭৬ শুদ্ধেন্দু ও দীপ্তি গঙ্গোপাধ্যায়, ২৭৬৩ সব্যসাচী ও শর্মিলা বসু।

একটা ঠিক ও দুটো প্রায় ঠিক :—

১১৫ অর্পিতা, কিশলয় ও কিশোর চক্রবর্তী, ১৭৫ অনিতা রায়, ৮৮৯ প্রেমেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ১৮৬৩ সোনালী লাহিড়ী, ২১৪২ স্বর্ণাভ ব্যানার্জি, ২২৩৯ অনীতা চট্টোপাধ্যায়, ২৩০৪ শুভব্রত মুখোপাধ্যায়, ২৪৪১ দেবোপম চক্রবর্তী, ২৫৪৪ সান্ত্বনা রায় চৌধুরী, ২৫৫৪ দেবাশিস ভট্টাচার্য।

দুটো উত্তর ঠিক :—

১০৪ উজ্জয়িনী, সুচরিতা, নবীনতা, সঞ্জয়, পার্থ ও শ্রাবণী ভট্টাচার্য, ২০৬৮ সুদীপ মৌলিক, ২৬৫৩ অসিত নাথ ভট্টাচার্য, ২৯৬৩ মৌসুমী ও শ্রাবণী গিরি।

একটি ঠিক ও একটি প্রায় ঠিক ঃ—

২২৬ জয়ন্ত ও প্রবালকুমার নন্দী রায়, ৪৪৮ অঞ্জনা, নূপুর ও মিলন কুমার বিদ্যান্ত, ৬১৪ দেবাশীষ ও স্নেহাশীষ হালদার, ৮৯৪ তপন ঘোষ, ১৩৩৬ অরূপ শঙ্কর চৌধুরী, ১৪২৫ মিত্রা রায় চৌধুরী, ২৫৪৮ সুদীপ্ত চক্রবর্তী, ২৫৯১ প্রবীর রায় চৌধুরী, ২৭৪০ সোনালী বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৭৬৪ প্রদীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

একটি উত্তর ঠিক ঃ—

১৪৮১ উত্তম কুমার বটব্যাল, ১৬০৩ নিশীথরঞ্জন, নীতীশরঞ্জন, সমীর ও মিতালী গুহ, ১৭৮০ সুপ্রতীক সনাতনী, ২৩৯৬ চিন্ময় ভট্টাচার্য।

ফাল্গুন-মাসের ধাঁধার উত্তর দাতাদের নাম।

সব কয়টি ঠিক ঃ—

১৮১ মিষ্টি ও বাসবেন্দু গুপ্ত, ১৯২ অন্তরা ও ফুল্লরা সেন, ২৫৪ জয়শ্রী রায়, ২৮৪ নূপুর ও মিঠু দাশগুপ্ত, ৩৯৩ নন্দিতা, বন্দনা দেবাশীষ ও জ্যোতির্ময় বরাট, ৮৩৮ সুপ্রতীক বাগচী, ৯৩৮ আলোকময় দত্ত, ১৪৪৪ পূরবী গুপ্ত, ১৪৬০ কেয়া বসু, ১৮৯৪ মুঞ্জিতা কাঞ্জিলাল, ১৯৩৮ লীনা মিত্র, ২০৭২ মৈত্রেয়ী বন্দ্যোপাধ্যায়, ২১৮৮ মহুয়া সেনগুপ্ত, ২২৫৭ উদয়ন মুখোপাধ্যায়, ২৪৬৭ মহাশ্বেতা ও অমিত বিক্রম ঘোষ, ২৫৪৪ সান্ত্বনা রায়চৌধুরী, ২৫৫৭ বিশ্বরূপ মুখোপাধ্যায়, ২৬১২ চৈতালী সান্যাল, ২৬২৯ চৈতালী বসু, ২৭১৩ সৌমিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৭৬৩ শর্মিলা ও সব্যসাচী বসু, ২৮১৬ তপতী দাশগুপ্ত, ২৮৬৩ ঝিনুক চৌধুরী, ২৯৪৭ শ্রাবণা গুহ, একজন নাম নম্বর হীন।

দুটো উত্তর ঠিক ও একটি প্রায় ঠিক ঃ—

১ দীপংকর বসু, ১১৫ অর্পিতা, কিশলয় ও কিশোর চক্রবর্তী, ১৭৫ অনিতা রায়, ৩২১ অজন্তা ও বন্দিতা ঘোষ, ৮৯৪ তপন ঘোষ, ৯৮৩ ঈশানী ও ইন্দ্রাণী মজুমদার, ১৩১০ আশীষ রহমান, ১৪১৮ শেখর নাহার, ১৪২৫ মিত্রা রায়চৌধুরী, ১৪৮১ উত্তমকুমার বটব্যাল, ১৬৭২ শুভ্রাশিস গুহ, ১৮২৭ অণুতোষ ও অশোক চট্টোপাধ্যায়, ২০২৯ শুভ্রা বিশ্বাস, ২১৫২ সুরজিৎ, অনুপ ও শিপ্রা পুরকায়স্থ, ২১৫৯ স্বাহা ও শুভঙ্কর বাগচী, ২২১৫ শুভা মজুমদার, ২৫৪৭ প্রসেনজিৎ ও মৈত্রেয়ী বসু, ২০৬৩ হেদায়েতুল্লাহ, ২৫৬৫ সুপ্রিয় ও সুমিতা ঘোষ, ২৫৯১ প্রবীর কুমার রায়চৌধুরী, ২৬৫৩ অসিতনাথ ভট্টাচায্য, ২৭০৯ শঙ্কর ঘোষ, ২৭৪২ সুপ্রভাত ও সুমিতা মৈত্র, ২৯৪০ রাণী বিনোদ মঞ্জরী রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ের নবমশ্রেণীর ছাত্রীবৃন্দ।

দুটো উত্তর ঠিক ঃ—

৫৭ শাশ্বতী দত্ত, ৭১ সেঁজুতি ও শিবশংকর চক্রবর্তী, ৩৭৯ অঞ্জনা সেন ও প্রজ্ঞা পারমিতা বসু, ৪৪৮ অঞ্জনা, নূপুর ও মিলন বিভ্রান্ত, ৭৯৩ শম্পা রায়, ৮৩৫ সৌমিত্র ও সুমিতা রায়, ৮৯০ কারুবাকী দত্ত, ৮৯৮ হিমাদ্রি ও দোলনচাঁপা চৌধুরী, ১৬৫৫ শৃণ্বন্তী পাল, ১৮০৫ দেবাশীষ রক্ষিত, ১৯০০ দীপঙ্কর চক্রবর্তী, ২৩০৪ শুভব্রত মুখোপাধ্যায়, ২৩৯৩ মোহম্মদ আমিরুদ্দীন চৌধুরী, ২৫৪৫ বিশ্বজিৎ দাশগুপ্ত ২৫৫৪ দেবাশাষ ভট্টাচার্য, ২৫৫৮ কুণাল চট্টোপাধ্যায়, ২৮৪৭ শর্মিলা রায়চৌধুরী, ২৮৭২ শ্রীকান্ত নন্দী, ২৯৬৩ মৌসুমী ও শ্রাবণী গিরি একজন নাম নম্বরহীন।

একটা ঠিক ও একটা প্রায় ঠিক ঃ—

৫৭৬ মনিদীপা চৌধুরী, ৮৮৯ প্রেমেন্দ্রনাথ ভটাচার্য, ১২৯৮ রুদ্রনাথ ঘোষ দস্তিদার, ১৪০১ মহাশ্বেতা গঙ্গোপাধ্যায়, ১৬০৩ নিশীথরঞ্জন, নীতীশরঙ্গন, সমীর ও মিতালী গুহ, ১৭৮০ সুপ্রতীক সনাতনী, ১৮৬৩ সোনালী লাহিড়ী, ২২৩৯ অনীতা ও প্রণব চট্টোপাধ্যায়, ২৩৬১ অঞ্জন ভট্টাচার্য, ২৩৯৬ চিন্ময় ভট্টাচার্য, ২৩৯৬ চিন্ময় ভট্টাচার্য, ২৬৭৬ শুদ্ধেন্দু ও সৌম্যেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়।

একটি উত্তর ঠিক ঃ—

২০৮৭ জয়শ্রী, স্বাগতা ও অরূপকুমার তরাত, ২৩৩২ দেবাশীষ মৈত্র, ২৬৯৫ অমিত পালচৌধুরী, ২৭২৬ শীলা সাহা, ২৮৪১ সুকান্ত দত্ত, ২৯৭৭ মিতা সেনগুপ্ত, ২৯৯২ সত্যকুমার গরাই।

ধাঁধা প্রতিযোগিতার ফলাফল—

সারা বছর ধরে তোমাদের যে ধাঁধা-প্রতিযোগিতা হয়েছে, তাতে কোন গ্রাহকেরই সব কয়টি উত্তর ঠিক হয়নি, কিন্তু অনেকেই খুব ভাল উত্তর দিয়েছে।

(১) মোট ২৪টি ধাঁধার মধ্যে ২৮১৬ তপতী দাশগুপ্ত ২৩টি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে। তা ছাড়া তার যুক্তির ধাঁধাগুলিও খুব ভাল হয়েছে, সুতরাং সে প্রথম পুরস্কার ১০'০০ পাবে।

(২) ১৯৩৮ লীনা মিত্র ২১টি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে আর দুটির উত্তরও প্রায় ঠিক। তার যুক্তিও খুব ভাল।

(৩) ২২৫৭ উদয়ন মুখোপাধ্যায় ২১টি ধাঁধার সঠিক এবং একটি ধাঁধার প্রায় ঠিক উত্তর দিয়েছে। তারও যুক্তিগুলি খুবই চমৎকার।

যদিও কোন দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুরস্কার দেবার কথা ছিল না। কিন্তু লীনা ও উদয়নের উত্তর খুব ভাল হবার দরুণ এদের দুজনকেই ৫৲ টাকা করে বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে।

চতুর্থ স্থান অধিকার করেছে ১৯২ অন্তরা ও ফুল্লরা সেন

পঞ্চম স্থান ৩২১ অজন্তা ও বন্দিতা ঘোষ, ৮৯৪ তপন ঘোষ ও ২২১৫ শুভা মজুমদার

ষষ্ঠ স্থানে আছে ১৭৫ অনীতা রায়, ২৮৪, নূপুর ও মিঠু দাশগুপ্ত, ১৪৬০ কেয়া বসু ১৪৮১ উত্তমকুমার বটব্যাল আর ১৫৪৪ সান্ত্বনা রায় চৌধুরী।

তাছাড়াও যাদের উত্তর খুব ভাল হয়েছে, তারা হল্ ৮৮৯ প্রেমেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ২১৫৯ স্বাহা বাগচী, ২৫৪৭ প্রসেনজিৎ ও মৈত্রেয়ী বসু। ২৬১২ চৈতালী সান্যাল, ১৮৯৪ সুস্মিতা কাঞ্জিলাল, ২৬২৯ চিত্রাঙ্গদা ও চৈতালী বসু, ২৬৭৬ শুদ্ধেন্দু ও সৌম্যেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, ২৭৬৩ সব্যসাচী ও শর্মিলা বসু। অনেকে সব মাসের উত্তর দাওনি অথবা প্রথম থেকে সুরু করনি বলে, ভাল উত্তর দিয়েও, উল্লেখযোগ্য মোট নম্বর পাওনি।

তোমরা সবাই আমাদের অভিনন্দন জেনো। আগামী বছর আবার ধাঁধা প্রতিযোগিতা করব, আরো বেশি সংখ্যক গ্রাহক প্রথম থেকে যোগ দিও আর সব সংখ্যার ধাঁধার উত্তর দিও, কেমন?

Particulars about SANDESH

1. Place of Publication – Calcutta
2. Periodicity of Publication—Monthly
3. *Printer's* Name—Shri Ashokananda Das
   Nationality—Indian (Bengali)
   Address—172/3, Rash Behari Avenue, Calcutta-29
4. *Publishers* Name—Ashokananda Das
   Nationality—Indian (Bengali)
   Address—172/3, Rasshbehari Avenue, Calcutta-29
5. *Editors* Name—(a) Satyajit Ray (b) Sm. Lila Majumder
   Nationality—Indian (Bengali)
   Address—(a) 1/1, Bishop Lefroy Road, Calcutta
   (b) 30, Chowringhee, Calcutta-16
6. *Owner*—Sukumar Sahitya Samavaya Samiti Ltd.

I Asokananda Das, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Date—March, 1970 Sd/- A. Das

প্রোফেসর শঙ্কু ও বাগদাদের বাক্স

সত্যজিৎ রায়

(আন্তর্জাতিক আবিষ্কারক-সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য বাগদাদে এসেছি। সঙ্গে আমার অমনিস্কোপ যন্ত্র, একাধারে টেলিস্কোপ, মাইক্রোস্কোপ ও এক্সরে।

কনফারেন্স শেষ হলে পরে আমি পেত্রুচিও ও গোল্ডস্টাইন হাসান অল-হাব্বালের সঙ্গে ঘুরে ফিরে দেখছি। 'প্রথম শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকদের কারসাজি' দেখাবার জন্য অল্-হাব্বাল আমাদের নির্জন এক পাহাড়ে জায়গায় এনেছেন। 'চিচিং ফাঁক' সংকেত উচ্চারণের সঙ্গে টিলার গায়ে একটা বিরাট পাথর গম্ভীর ঘড় ঘড় গর্জনের সঙ্গে এক পাশে সরে গিয়ে একটা পথ করে দিল।)

(২)

আমরা অল্-হাব্বালের পিছন পিছন গুহায় প্রবেশ করলাম। অল্-হাব্বাল্ এবার বলে উঠল, 'চিচিং বন্ধ্'!

সঙ্গে সঙ্গে ঘর্ ঘর্ শব্দ করে পাথরের ফটক বন্ধ হয়ে গেল, আর এক দুর্ভেদ্য অন্ধকার আমাদের সকলকে ঘিরে চেপে ধরল। অল্-হাব্বালের মতলব কি? সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে কেমন জানি একটা ভেলকীর গন্ধ পাচ্ছিলাম সেটা আমার মোটেই ভালো লাগছিল না।

এবার একটা দেশলাই জ্বালার শব্দ পেলাম, আর তার পরেই গুহার ভিতরটা একটা ম্লান হলদে আলোয় ভরে উঠল। অল্-হাব্বাল একটা ল্যাম্প জ্বালিয়েছে! ল্যাম্পের আলোতে গুহার ভিতরের চারিদিকে চেয়ে দেখে বুঝতে পারলাম, ছেলেবেলার এক কাল্পনিক ছবি আজ আমার চোখের সামনে সম্ভব হয়ে দেখা দিয়েছে। আমরা যার ভিতরে দাঁড়িয়ে আছি, সেটাকে আরব্যোপন্যাসের আলিবাবার গুহা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। গুহার চারিদিকে পাথরের গা কেটে তৈরি করা তাক আর খুপরিতে রয়েছে বিচিত্র জিনিস। বাক্স প্যাঁটরা ঘটি বাটি চেয়ার ফুলদানি কলসী কুঁজো-কত রয়েছে তার হিসেব নেই। এর সবই কোন্-না-কোন্ ধাতুর তৈরি কয়েকটা ত সোনারও হতে

পারে বলে মনে হয়। আর প্রত্যেকটা জিনিসের গায়েই নানান্ রঙের পাথর বসানো—যা থেকে ল্যাম্পের আলো প্রতিফলিত হয়ে গুহার ভিতরটায় একটা অদ্ভুত রঙ-বেরঙের বর্ণচ্ছটার সৃষ্টি করেছিল।

আমরা স্তব্ধ হয়ে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখছি, এমন সময় গোল্ডস্টাইন হঠাৎ তার ভারী গলায় চেঁচিয়ে উঠল—'আমাদের কি কচি খোকা পেয়েছ? বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে বুজরুকি?'

আশ্চর্য, এবারে ধমকানি সত্ত্বেও অল্-হাব্বালের মধ্যে কোন বিরক্তির ভাব লক্ষ্য করলাম না। পিদিমের কম্পমান আলোয় দেখলাম যে সে গোল্ডস্টাইনের দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছে, আর ধীরে ধীরে মাথা নাড়ছে। তারপর সে বলল, 'পাঁচ হাজার বছর আগের সুমেরিয়ান লেখা তোমরা কেউ পড়তে পার?'

পেক্রুচিও বলে উঠল, 'আমি পারি। আমি প্রত্নতাত্ত্বিক ছিলাম। আজ থেকে বারো বছর আগে এই ইরানের মরুভূমিতেই খোঁড়ার কাজ করতে করতে হীট-স্ট্রোক হয়ে আমি প্রায় মারা যাই। তারপর থেকে 'ডিগিং' ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু কেন জিজ্ঞেস করছ তুমি?'

অল্‌হাব্বাল্ পিদিমটা গুহার একটা কোনের দিকে নিয়ে গেল। দেখলাম সেখানে প্রায় আমার সমান উঁচু আর হাত দুয়েক চওড়া একটা ছাই-রঙের পাথর দাঁড় করানো রয়েছে। তার গায়ে খোদাই করে যেন কিছু লেখা। অল্ হাব্বাল্ বলল, 'দেখত কী লেখা আছে এতে।'

পেক্রুচিও হুমড়ি খেয়ে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে নিজের হাতে পিদিম নিয়ে লেখাটা পড়তে শুরু করল। প্রথমে কিছুক্ষণ সে শুধু বিড় বিড় করল। তারপর প্রায় দশ মিনিট পরে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এ পাথর কোথায় পেলে! এতো এখানকার জিনিস নয়।'

অল্ হাব্বাল্ বলল, 'আগে বলো ওতে কী লেখা আছে।'

পেক্রুচিও বলল, 'একে এই গুহার বর্ণনা আছে, তার অবস্থান বলা আছে, আর তার ফটক খোলার সংকেত আছে। আর বলা আছে—এই গুহার ভিতরে যাদুকর শ্রেষ্ঠ গেমাল নিশাহিরের কবর আছে, আর তার সঙ্গে তার তৈরি একটা আশ্চর্য বাক্সও এখানেই রাখা আছে।'

'আর কিছু বলে নি?' অল্ হাব্বালের শান্ত কণ্ঠস্বরের মধ্যে এমন একটা চাপা উত্তেজনার ভাব লক্ষ্য করলাম।

'হ্যাঁ—আরো আছে।'

'কী?'

'বলছে, বাক্সটা নাকি জীবন্ত ইতিহাসের কাজ করবে, এবং এই ইতিহাস যে অবিশ্বাস করবে, বা এই বাক্সের যে অনিষ্ট করবে, তার উপর নাকি জিগুরাৎ-এর দেবতার অভিশাপ বর্ষিত হবে।'

অল্ হাব্বাল্ গম্ভীর ভাবে মাথা নেড়ে বলল, 'হুঁ'—আর সঙ্গে সঙ্গে গোল্ডস্টাইন আবার গর্জন করে উঠল, 'ফটক খুলে দাও। বন্ধ গুহায় বেশিক্ষণ থাকা যায়না—এর বায়ু দূষিত!'

আমার মনে হল, গোল্ডস্টাইন একটু বাড়াবাড়ি করছে। অল হাব্বাল ওর চীৎকারে কর্ণপাতে

করল না। পেত্রুচিও বলল, দেখে মনে হয় এ পাথর কিশ অঞ্চল থেকে এসেছে। কিন্তু এটা তুমি কী করে পেলে সেটা জানার কৌতূহল হচ্ছে।'

অলহাব্বালের উত্তর শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। উদ্বেগ বা উত্তেজনার কিছুমাত্র আভাস না দিয়ে সে বলল সাত বছর আগে স্যার জন হলিংওয়ার্থ কিশ অঞ্চলে যে খননের কাজ করতে এসেছিলেন, সে কথা তোমার নিশ্চয়ই জান। আমি সে দলের সঙ্গে ছিলাম সরকারী দোভাষী হিসেবে সেবারই এই পাথরটি খুঁড়ে পাওয়া যায়, আর স্যার জন এর লেখার মানে করার আগেই আমি গোপনে সে-কাজটা সেরে ফেলি। আর তার পরদিনই আমি পাথরটাকে নিয়ে যাকে বলে সরে পড়ি। এতে আমি কোন দোষ দেখিনি। এখনো দেখিনা। কারণ এতো আমাদেরই দেশের জিনিস। এ জিনিসটা সাহেবের হাতে পড়লে কি আর বাগদাদে থাকত? এ চলে যেত হয় বৃটিশ মিউজিয়ম না হয় পশ্চিমের অন্য কোন যাদুঘরে। আমি বরং এটাকে আমাদেরই দেশে রেখে দিয়েছি, এবং এমন একটা নিরাপদ জায়গায় সেখানে এর কোনদিন কোন ক্ষতি হতে পারবেনা।'

গোল্ডস্টাইন এতক্ষণ একটা পাথরের ঢিবির উপর বসে ছিল, এখন হঠাৎ একেবারে ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে লাফিয়ে উঠে চীৎকার করে উঠল 'দুর্বৃত্ত! ভণ্ড! জোচ্চোর! এই সব পাথরের লেখা আর গুহার অন্যসব জিনিসপত্তরের কথা জানিনা, কিন্তু ফটক খোলার কারসাজিকে তুমি ৫০০০ বছর আগের বৈজ্ঞানিক কীর্তি বলে পাচার করতে চাও? তুমি বলতে চাও এর পেছনে কোন আধুনিক বৈজ্ঞানিক কেরামতি নেই? এই সব পাথরের ফাটলের মধ্যে বৈদ্যুতিক কলকব্জা লুকোন নেই?'

অল্‌ হাব্বাল্‌ ডান হাতটা তুলে গোল্ডস্টাইনকে শান্ত হবার ইঙ্গিত করে বললেন, 'আপনি যে ভাবে চেঁচাচ্ছেন, তাতে ভয় হয় যিনি আজ পঞ্চাশ শতাব্দী ধরে এই গুহায় কঙ্কাল অবস্থায় বিশ্রাম করছেন, তিনিও না অস্থির হয়ে ওঠেন। দোহাই, মিস্টার গোল্ডস্টাইন—আপনি অতটা উত্তেজিত হবেন না!'

গোল্ডস্টাইন কেমন যেন একটু থতমত খেয়ে চাপাস্বরে বলল, 'কঙ্কাল?'

অল্‌-হাব্বাল পিদিমটা আবার তুলে নিয়ে পাথরের ফলকটার পিছন দিকটায় এগিয়ে গেল আমরাও সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গিয়ে দেখি, গুহাটা এখানে একটা চতুষ্কোণ চত্বরের চেহারা নিয়েছে। তার

মাঝখানে একটা প্রায় চার হাত গভীর গর্ত। সেই গর্তের ভিতরে পিদিমটা নামাতেই চীৎ হয়ে শোয়া একটা কঙ্কাল আর তার পাশে ছড়ানো কিছু পোড়ামাটির হাঁড়িকুড়ি দেখতে পেলাম।

অল্-হাব্বাল কঙ্কালের দিকে তার ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'যাদুকর শ্রেষ্ঠ গেমাল নিশাহির অল্ হারারিৎ।'

পিদিমের আলোয় দেখলাম গোল্ডস্টাইনের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। সে মুখ বিকৃত করে বলে উঠল, 'বাগদাদে এসে এসব বীভৎস তামাসা কেন বরদাস্ত করতে হবে তা আমি বুঝতে পারছি না। তুমি ফটক খুলবে কিনা বলো।'

অল্ হাব্বাল্ শান্ত ভাবে কঙ্কালের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে গোল্ডস্টাইনের দিকে তাকাল।

গোল্ডস্টাইন অল্ হাব্বালের জন্য অপেক্ষা না করেই চীৎকার করে উঠল—

'চিচিং ফাঁক!'

কয়েক মুহূর্ত আমরা স্তব্ধ হয়ে ফটকের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিন্তু চীৎকারে কোন ফল হল না। ফটক যেমন বন্ধ তেমন বন্ধই রইল। গোল্ডস্টাইন এবার রাগে কাঁপতে কাঁপতে অল্ হাব্বালের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার টুঁটিটা টিপে ধরল।

'তুমি এক্ষুণি ফটক খুলবে কিনা বল।'

আমি আর পেত্রুচিও দুজনে মিলে কোনমতে গোল্ডস্টাইনকে নিরস্ত করলাম। অল্ হাব্বাল্ তার গলার স্বর গম্ভীর করে বলল, 'প্রোফেসার গোল্ডস্টাইন—আপনি বৃথা উত্তেজিত হচ্ছেন। যন্ত্রটা একটা বিশেষ সুরে উচ্চারণ না করলে ফটক খুলবে না—আর সে-সুর একমাত্র আমারই জানা আছে গুহা আবিষ্কার করার পর ক্রমাগত বিশ দিন ধরে মন্ত্রটা বার বার আবৃত্তি করে তবে আমি ঠিক সুরটা আবিষ্কার করতে পেরেছি। সুতরাং—'

গোল্ডস্টাইন অধৈর্য ভাবে বলল, 'তাহলে তুমিই বল। আমি আর এই বদ্ধ গুহায় থাকতে পারছি না।'

অল্ হাব্বাল্ বলল, 'কিন্তু তোমাদের এখানে নিয়ে আসার কারণটা না বলে আমি কী করে ফটক খুলি? তোমরা যদি আমার অনুরোধ রক্ষা না কর?'

'কী অনুরোধ?' আমরা তিনজনে একসঙ্গে জিজ্ঞেস করে উঠলাম।

অল্ হাব্বাল্ এবার প্রদীপটা নিয়ে গুহার মধ্যিখানটায় এগিয়ে গেলেন। প্রদীপের আলোয় একটা চৌকোণা পাথরের ঢিবি দেখতে পেলাম। তারপর আরো কাছে যেতে দেখতে পেলাম ঢিবিটার উপর একটা অদ্ভুত দেখতে বাক্স রাখা রয়েছে। বাক্সটা মনে হল তামার, কিন্তু তার উপর সোনা ও রুপোর কাজ করা রয়েছে। আর রয়েছে নানান রঙের নানান সাইজের পাথর বসানো। বাক্স বলছি, কিন্তু সেটাকে যে খোলা যায়, বা তার যে কোন ঢাকনা বা ডালা বলে কিছু আছে, সেটা দেখে মনে হয় না।

গোল্ডস্টাইন বলল, 'এটা কী?'

পেক্রুচিও বলল, 'এ বাক্সটার কথাই কি ওই পাথরে লেখা আছে ?'

অল্ হাব্বাল বলল, 'তাছাড়া আর কী ? কারণ এই গুহাটা যখন প্রথম আবিষ্কার করি তখন এর ভিতরে ও কঙ্কাল আর এই বাক্স ছাড়া আর কিছুই ছিলনা।'

আমি বললাম 'কিন্তু লেখায় যে বলছে এর ভিতরে ইতিহাস জীবন্ত ভাবে রক্ষিত হয়েছে—সে ব্যাপারটা কী ?'

অল্ হাব্বালের মুখে একটা ম্লান হাসি ফুটে উঠল। বলল—

সেইটেইত আসল প্রশ্ন। সেইখানেই ত মুশকিল। আমার বুদ্ধিতে এর রহস্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব হচ্ছেনা। আমি অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু কৃতকার্য হইনি। এবারে বুঝতে পারছ তোমাদের এখানে আনার কারণটা ?

আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করলাম অবশেষে গোল্ডস্টাইন বলল, 'তুমি চাইছ আমরা এটার রহস্য উদ্ঘোটন করি ?'

অল্ হাব্বাল বলল, 'আমি কাউকে জোর করতে চাইনা সে-ইচ্ছা আমার নেই। আমি কেবল অনুরোধ করতে পারি।'

গোল্ডস্টাইন বলল, 'আমি এর মধ্যে নেই সেটা আমি স্পষ্টই বলে দিচ্ছি। আমার বিশ্বাস ওর মধ্যে কিছু নেই।'

গোল্ডস্টাইন বাক্সটা হাতে তুলে নিল।

অল্ হাব্বাল বাধা দিলনা, কেবল গম্ভীর চাপা গলায় বলল, 'ওটার অবমাননা করলে জিগুরাৎ-এর দেবতা অসন্তুষ্ট হবেন।'

গোল্ডস্টাইন একটা তাচ্ছিল্যের ভাব করে বাক্সটাকে রেখে দিল। এবার আমি সেটাকে অতি সন্তর্পণে হাতে তুলে নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগলাম, পেক্রুচিও আমার পাশে দাঁড়িয়ে।

অল্ হাব্বাল প্রদীপটা নিয়ে আমাদের আরো কাছে এগিয়ে এলো।

বাক্সটা ওজনে বেশ ভারী। হাতটা অল্প নাড়া দিতে ভিতর থেকে সামান্য একটা শব্দ পেলাম। বুঝলাম ভিতরে কিছু আলগা জিনিস আছে।

অবশেষে আমি বললাম, 'গুহার ভিতরে এর রহস্য উদ্ঘাটন সম্ভব হবেনা! তুমি কি এটা আমাদের হোটেলে নিয়ে যেতে দেবে ? শুধু আজকের দিনের জন্য ? আমি কথা দিচ্ছি এর কোন অবমাননা আমি করব না।'

অল্ হাব্বাল কিছুক্ষণ একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে থেকে বলল, 'জিগুরাৎ-এর দেবতার অলৌকিক শক্তিতে তোমার বিশ্বাস আছে ?

আমি বললাম 'প্রাচীন জিনিসের প্রতি আমার অসীম শ্রদ্ধা আছে, বিশেষত সে-জিনিস যদি এত সুন্দর হয়।'

অল্ হাব্বাল একটু হেসে বলল, 'তাতেই হবে!'

আবার আমাদের দিক থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে ফটকের দিকে মুখ করে তার সেই অদ্ভুত সুরেলা গলায় বলে উঠল—'চিচিং ফাঁক্।'

চোখের সামনে দেখতে দেখতে আবার সেই ঘর ঘর্ ঘর্ শব্দ করে পাথরের ফটক ফাঁক হয়ে দিনের আলো এসে গুহায় প্রবেশ করল। আমরা বাইরে বেরিয়ে গিয়ে হাঁপ ছাড়লাম।

অল্ হাব্বালের লাঞ্চ বাস্কেট থেকে চমৎকার ফল, মিষ্টি, পাঁউরুটি ও চীজ খেয়ে প্রায় সন্ধ্যা সাতটার সময় সে অদ্ভুত বাস্ক নিয়ে আমারা হোটেলে ফিরলাম। গোল্ডস্টাইন এখনো গজর গজর থামায়নি। আমরা যে অল্ হাব্বালের কথায় কান দিয়েছি, তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছি, তার বাক্সের রহস্য উদ্ঘাটনের ভার নিয়েছি—এর কোনটাই যেন সে বরদাস্ত করতে পারছেনা। হোটেলের ভিতর ঢুকে সে আমাদের সামনেই অল্ হাব্বালকে বলল, 'যদি বুঝতে পারি তুমি আমাদের ধাপ্পা দিয়েছ তাহলে পুলিশে রিপোর্ট করব। তুমি যে চোর, সেটা নিজেই স্বীকার করেছ—সুতরাং তোমাকে উপযুক্ত শাস্তি পাইয়ে দিতে আমাদের কোনই অসুবিধে হবেনা। একথা যেন মনে থাকে।'

অল্ হাব্বাল্ হেসে বলল, 'বিরাশি বছর বয়সে আর কী শাস্তি দেবে তোমরা? আমার জীবনের শুধু একটি সাধই মিটতে বাকি আছে, সেটা হল ওই বাক্সের গুণ কী সেটা জানা। এটা জানতে পারলেই আমার মোক্ষ। তারপর আমি মরি কি বাঁচি, আমার শাস্তি হয় কি না হয় সে সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র উদ্বেগ বা কৌতুহল নেই।'

তারপর আমার দিকে ফিরে সে বলল, 'আপনাদের পক্ষে আমার খোঁজ করা মুশকিল হবে কারণ আমার টেলিফোন নেই। আমি নিজেই কাল সকালে এসে দেখা করব।'

এই বলেই আমাদের তিনজনকেই কুর্নিশ করে অল্ হাব্বাল হোটেলের দরজা দিয়ে বেরিয়ে বাইরের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এখন বেজেছে রাতে সাড়ে দশটা। গত দুঘণ্টা ধরে আমি আর পেত্রুচিও আমার ঘরে বসে বাক্সটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে কেবল একটা জিনিস আবিষ্কার করেছি। এটার গায়ে বসানো অনেকগুলো পাথরের মধ্যে একটা বেশ বড় কার্ণেলিয়ান পাথর রয়েছে যেটা প্যাঁচ দিয়ে বসানো। অর্থাৎ, সেটাকে খোলা যায়। পাথরটাকে খুলেওছি আমরা, আর খুলে দেখেছি যে পাথরটার পিছনে একটা ছোট্ট কৌটোর মত জিনিস রয়েছে। সেটার রঙ কালো। গন্ধ শুঁকে মনে হল সেটায় প্যারাফিন বা মোম জাতীয় কোন জিনিস জ্বালানো হয়েছে, যার ফলে ওটার রঙ কালো হয়ে গিয়েছে। ইচ্ছে ছিল ওখানে একটা সলতে দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দেখা—কিন্তু এতরাত্রে প্যারাফিন জাতীয় জিনিস কোথায় পাব? কাল সকালে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম জোগাড় করে আবার পরীক্ষা করে দেখা যাবে।

গোল্ডস্টাইন একবারও আমার ঘরে আসেনি। ওকে ফোন করেছিলাম। বলল ওর শরীর ভালো নেই—মাথায় এবং পেটে যন্ত্রণা হচ্ছে। জিগুরাৎ-এর দেবতার যদি সত্যিই কোন অলৌকিক ক্ষমতা থেকে থাকে, তাহলে হয়ত সে এর মধ্যেই গোল্ডস্টাইনের উপর অভিশাপ বর্ষণ করতে শুরু করেছে, এবং তার ফলেই তার শরীর খারাপ! কে জানে!…

২১ নভেম্বর, সকাল সাড়ে ছটা

আজ এই অল্প কিছুক্ষণ আগে যে আশ্চর্য ঘটনাটা ঘটে গেল সেটা এই বেলা লিখে রাখি।

আমি এমনিতেই খুব ভোরে উঠি, গিরিডিতে রোজ পাঁচটায় উঠে আমি উশ্রীর ধারে বেড়াতে যাই। আজ মনে একটা উত্তেজনার ভাব থাকার দরুণই বোধহয় আরো সকালে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। মুখ ধুয়ে স্নান করে কফি খেয়ে যখন জানালাটার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি, তখন আকাশ ফরসা হয়ে গেছে। সারা আকাশময় তুলো-পেঁজা মেঘ ; তাতে রঙের খেলা দেখতে দেখতে গতকালের আরব্যোপন্যাসের গুহার কথা ভাবছিলাম। আর ভাবছিলাম যাদুমন্ত্র 'চিচিং ফাঁক-এর কথা। ভাবতে ভাবতে কখন যে গলা দিয়ে মন্ত্রটা নিজেই উচ্চারণ করে ফেলেছি তা জানি না। একবার নয়—বার তিনেক অন্যমনস্ক ভাবে 'চিচিং-ফাঁক' কথাটা বলার পর হঠাৎ একটা খটাং শব্দ শুনে চমকে পিছনে ফিরে দেখতে হল।

বাক্সটা আমার খাটের পাশের টেবিলের উপর রাখা ছিল। এখন সেটার দিকে চেয়ে দেখি তার এক পাশের একটা অংশ ফাঁক হয়ে দরজার মত খুলে গিয়েছে। অবাক হয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখি, একটা আধুলির সাইজের ল্যাপিস ল্যাজুলি পাথর, ঠিক যেমন ভাবে দরজা খুলে যায়, সেইভাবে খুলে গিয়ে একটা ছোট্ট কব্জার সঙ্গে আটকানো ঝুলে আছে। আশ্চর্য—গুহা এবং বাক্স খোলার জন্য একই সংকেত, কেবল বলার সুরে সামান্য একটু তফাৎ।

খুলে-যাওয়া দরজাটার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারলাম। ভিতরে এক অদ্ভুত ব্যাপার : অত্যন্ত ছোট ছোট সব যন্ত্রপাতি জাতীয় জিনিস দিয়ে ভিতরটা ভরা। তার মধ্যে ধাতুর তৈরী জিনিস ত আছেই —তাছাড়া আছে পুঁতি বা কাঁচের টুকরো জাতীয় জিনিস। সেগুলো যে কী, সেটা বোঝা ভারী মুশকিল, কারণ এরকম যন্ত্রপাতি এর আগে কখনো দেখিনি। আমার অমনিস্কোপ মাইক্রোস্কোপ হিসাবে ব্যবহার করেও বিশেষ লাভ হল না—আমি যেই তিমিরে সেই তিমেরেই রয়ে গেলাম।

বাক্সটাকে তুলে জানালার কাছে এনে দিনের আলোতে এই প্রথম সেটাকে ভালো করে দেখলাম। যেদিকটায় কার্ণেলিয়ান পাথরটা প্যাঁচ দিয়ে লাগানো ছিল, তার ঠিক উল্টোদিকটায় এবার লক্ষ্য করলাম একটা ছোট্ট ফুটো রয়েছে। অমনিস্কোপ চোখে লাগিয়ে বুঝলাম তার ভিতরে একটা পাথর বসানো রয়েছে। হীরে কি ? তাইত মনে হচ্ছে—তবে এটার যে কী ব্যবহার সেটা ধরতে পারলাম না।

এখন যেটা আসল দরকার সেটা হল বাক্সর ভিতরের বাতিটা জ্বালানো। পেত্রুচিও বলেছে সকালে দোকানপাট খুললেই ও প্যারাফিন সংগ্রহ করে আনবে। তারপর বাক্সর ভিতরের প্রদীপটা জ্বালালে হয়ত এর রহস্য উদ্ঘাটন হতে পারে। আমি জীবনে অনেক উদ্ভট যন্ত্রপাতি ঘেঁটেছি—কিন্তু এরকম মাথা-গুলোন জিনিস এর আগে কখনা আমার হাতে পড়েনি।

২২ নভেম্বর, রাত আটটা

ধন্য হারুণ-অল্-রশিদের বাগদাদ! ধন্য সুমেরিয় সভ্যতা! ধন্য বিজ্ঞানের মহিমা! ধন্য

গেমাল নিশাহির আল্ হারারিৎ !

আমার এ উল্লাসের কারণ আর কিছুই না—আজ একজন এমন বৈজ্ঞানিক প্রতিভার পরিচয় পেয়েছি যার কাছে আমাদের কৃতিত্ব একেবারে ম্লান হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আমি ত ঠিক করেছি এখান থেকে যাবার আগে টাইগ্রিসের জলে আমার অম্নিস্কোপটা ফেলে দিয়ে যাবো। গিরিডিতে ফিরে গিয়েও কাজে উৎসাহ কবে কীভাবে ফিরে পাবো জানি না। আনন্দ, বিস্ময়, হতাশা এবং তার সঙ্গে কিছুটা রোমাঞ্চ ও আতঙ্ক মিলে মনের অবস্থা এমন হয়েছে যেমন এর আগে আর কখনো হয় নি।...

কাল সকালে ডায়রি লিখে শেষ করার আধ ঘণ্টার মধ্যেই অল্ হাব্বাল্ টেলিফোন করেছিল। বলল, 'কী রকম বুঝছ ? রহস্য উদ্‌ঘাটন হল ?'

আমি সকালের ঘটনাটা বলতেই ও ভারী উত্তেজিত হয়ে বলল, 'আমি এক্ষুণি আসছি। সঙ্গে করে প্যারাফিন নিয়ে আসছি। পেত্রুচিওকে বলে দাও ও যেন আর কষ্ট করে বাজারে না যায়।'

আমরা তিন বৈজ্ঞানিক এক সঙ্গে ব্রেকফাস্ট করলাম। গোল্ডস্টাইনের চেহারা দেখে মোটেই ভালো লাগল না। ও শুধু এক পেয়ালা কফি খেলো। বলল, 'কাল রাত্রে মোটেই ঘুম হয়নি—আর যেটুকু ঘুমিয়েছি, তার মধ্যে সব বিশ্রী বিশ্রী স্বপ্ন দেখেছি।'

পেত্রুচিও একটু ঠাট্টা করে জিগুরাতের দেবতার অভিশাপের কথা বলতেই গোল্ডস্টাইন রীতিমত বিরক্ত হয়ে বলল, 'তোমাদের কুসংস্কারের নমুনা দেখে আর তোমাদের বৈজ্ঞানিক বলতে ইচ্ছে করেনা। আমার শরীর খারাপের একমাত্র কারণ কাল ওই বিদ্‌ঘুটে গুহায় অতক্ষণ বন্ধ অবস্থায় থাকা। এ ছাড়া আর কোন কারণ নেই, বা থাকতেও পারে না।'

ওর অন্য কিছু করার ছিল না বলেই বোধ হয় শেষ পর্যন্ত যখন অল্ হাব্বাল্ প্যারাফিন নিয়ে আমাদের ঘরে হাজির হল, গোল্ডস্টাইনও দেখি তার সঙ্গে সঙ্গে এসে ঘরের সোফাটায় ধুপ্ করে বসে পড়ল। বাইরের লোক যাতে হঠাৎ এসে না পড়ে, তাই ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আমরা আমাদের কাজে লেগে পড়লাম।

প্রথমে কার্নোলিয়ান পাথরটা প্যাঁচ দিয়ে খুলে পিছন থেকে কৌটোটা বার করে তাতে প্যারাফিন ভরলাম। তারপর আমার একটা রুমাল ছিঁড়ে সেটা দিয়ে একটা সলতে পাকিয়ে প্যারাফিনে চুবিয়ে দিয়ে তার ডগটায় আগুন ধরিয়ে দিলাম। গোল্ডস্টাইন আমাদের ঠিক সামনেই বসেছিল। সলতেটায় আগুন দিয়ে কৌটাটা ভিতরে ঢোকাতেই দেখি কোত্থেকে জানি একটা আলো এসে গোল্ডস্টাইনের গায়ে পড়ল। এটা কীরকম হল ?

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই আমার ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটা কেটে দিয়ে মনে পড়ল বাক্সটার সামনের দিকের ছোট্ট পাথরটার কথা।

স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে পাথরটা একটা লেন্স-এর কাজ করছে ; ভিতরে প্রদীপটা জ্বালানোর

ফলে লেন্‌সের ভিতর দিয়ে আলো বেরিয়ে সেটাই গোল্ডস্টাইনের গায়ে পড়ছে।

আল্‌হাব্বালের চোখ দেখি জ্বলজ্বল করছে। গোল্ডস্টাইনেরও কেমন জানি থতমত ভাব। সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে এক পাশে সরে গেল। অল্‌হাব্বাল্ দৌড়ে গিয়ে সোফাটাকে একপাশে টেনে সরিয়ে দিল। তার ফলে তার পিছন দিকে যে দেয়ালটা বেরোল, আলোটা স্বভাবতই তারই উপর পড়ল। এবার বুঝলাম আলোর শেপটা একটা টর্চের আলোর মত বৃত্তাকার।

পেক্রচিও হঠাৎ তার মাতৃভাষায় চেঁচিয়ে উঠল—'লা লানতের্ণা মাজ্জিকা!'

অর্থাৎ ম্যাজিক ল্যানটার্ণ। কিন্তু ছবি কই?

সকালে 'চিচিং ফাঁক' বলার ফলে যে পাথরটা দরজার মত খুলে গিয়েছিল—এবারে সেটার দিকে দৃষ্টি দিলাম। দরজা এখনো খোলাই রয়েছে। অতি সাবধানে আমার ডান হাতের তর্জনীটা তার ভিতর ঢুকিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করতেই একটা পেনসিলের ডগার মত জিনিস অনুভব করলাম। সেটায় অল্প একটু চাপ দিতেই একটা অভাবনীয় জিনিস ঘটে গেল, যেটার কথা ভাবতে এখনো আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে।

চাপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাক্সটার ভিতর একটা আলোড়ন সুরু হল—যেন নানারকম যন্ত্রপাতি ভিতরে চলতে শুরু করেছে। দেয়ালের দিকে চেয়ে দেখি সেই গোল আলোটার ভিতর যেন একটা স্পন্দন শুরু হয়েছে। তারপর আলোর উপর সব বিচিত্র নকসা প্রতিফলিত হতে শুরু করল।

প্রেক্রচিও দৌড়ে গিয়ে আমার ঘরের জানালাটা বন্ধ করে দিল। ঘর এখন অন্ধকার—একমাত্র বাক্স থেকে বেরোন আলো ছাড়া আর কোন আলো নেই।

আর দেয়ালে? স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখলাম যে দেয়ালে সিনেমা হচ্ছে—বায়স্কোপ—চলচ্চিত্র! ছবি অস্পষ্ট—কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হয় না। আর সে ছবি চলমান ছবি। আজকের সিনেমার সঙ্গে তার কোনই তফাৎ নেই—কেবল ছবি চৌকোর বদলে গোল।

কিন্তু এসব কিসের ছবি দেখছি আমরা? কোন্ সহরের দৃশ্য এটা? এই লোকজন সব কারা? এত ভীড় কেন? কিসের উৎসব হচ্ছে?

পেক্রচিও চেঁচিয়ে উঠল—'শবযাত্রা! কোনো বিখ্যাত লোক মারা গেছে! ওই দ্যাখ তার কফিন!'

সত্যিইত। আর কফিনের পিছনে বয়ে চলেছে জনতার স্রোত। কত লোক হবে? দশ হাজার? অদ্ভুত এইসব লোকের পোশাক—অদ্ভুত তাদের চুলের বাহার! লক্ষ্য করলাম যে অনেকের হাতেই একরকম কারুকার্য করা হাতপাখা রয়েছে যেটা তারা সবাই একসঙ্গে নাড়ছে। আরো দেখলাম—ভীড়ের মধ্যে অনেকগুলো চারচাকার গাড়ি সেগুলো টেনে নিয়ে চলেছে গরু-জাতীয় এক ধরণের জানোয়ার।

পেক্রিচিও আবার চেঁচিয়ে উঠল—'বুঝেছি! উর! উর দেশের কোন রাজা মারা গেছে। এদের কোন রাজা মরলে সঙ্গে সঙ্গে আরো ৬০।৭০ জন লোককে বিষ খেয়ে মরতে হত। আর সবাইকে এক সঙ্গে কবর দেওয়া হত!

আমি যেন আর দেখতে পারছিলাম না। আমার মাথা ঝিম ঝিম করতে শুরু করেছিল। আমি টেবিলের পাশ থেকে সরে গিয়ে খাটের উপর বসে পড়লাম। চার হাজার বছর আগের এই বায়স্কোপ আমার মাথা একেবারে গণ্ডগোল করে দিয়েছিল।

ছবি কতক্ষণ চলেছিল জানি না! হঠাৎ দেখলাম আবার ঘরের বাতি জ্বলে উঠল, আর অল্ হাব্বাল্ ফুঁ দিয়ে বাক্সর বাতিটা নিভিয়ে দিল। তার চোখে মুখে এমন এক অদ্ভুত ভাব, সে যেন কী বলবে কী করবে সেটা ঠিক বুঝতে পারছে না। এদিকে আমরা তিন বৈজ্ঞানিক একেবারে অভিভূত—আমাদের মুখ দিয়েও কোন কথা সরছে না।

অবশেষে অল্ হাব্বাল্ই প্রথম কথা বলল। দুহাত জোড় করে আমাদের তিনজনের দিকে কুর্ণিশ করে সে বলল, 'আমি যে তোমাদের কী ভাবে কৃতজ্ঞতা জানাবো তা বুঝতে পারছি না। আমার জীবনের শেষ বাসনা তোমরা পুর্ণ করেছ। আমাদের দেশের প্রাচীন সভ্যতার একটা অত্যাশ্চর্য নমুনা যে তোমাদের দেখাতে পেরেছি, তার জন্য আমি কৃতার্থ। তবে শুধু একটা কথা—এই যন্ত্রটির কথা তোমরা প্রকাশ করবে না। করলেও, তোমাদের কথা কেউ বিশ্বাস করবে বলে মনে হয় না। ডক্টর গোল্ডস্টাইন আমাকে ভণ্ড বলেছিলেন, তোমাদের লোকে বলবে পাগল। আর প্রমাণও ত তোমরা দিতে পারবে না, কারণ বাক্সটা গত চার হাজার বছর সেখানে ছিল, ভবিষ্যতেও সেখানেই থাকবে। আমি তাহলে আসি! সেলাম আলেইকুম্!'

অল্ হাব্বাল্ সঙ্গে করে তার বেতের লাঞ্চ বাস্কেটটা নিয়ে এসেছিল; তার মধ্যেই বাক্সটা বয়ে নিয়ে সে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

কিছুক্ষণ তিনজনেই বোকার মত চুপ করে বসে রইলাম। তারপর পেত্রুচিও গোল্ডস্টাইনের দিকে ফিরে বলল, 'তোমার এখনো মনে হয় লোকটা ভণ্ড?'

গোল্ডস্টাইনকে দেখে মনে হল সে থতমত ভাবটা কাটিয়ে উঠেছে। তার মাথায় যেন অন্য কোন চিন্তা খেলছে—তার চোখ জ্বলজ্বল করছে। সে এতক্ষণ চেয়ারে বসেছিল, এবার উঠে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ অসহিষ্ণুভাবে পায়চারি করে হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বলল, 'অমন একটা জিনিস এই গুহার মধ্যে বন্ধ পড়ে থাকবে? এ হতেই পারে না!'

গোল্ডস্টাইনের কথা আমার মোটেই ভাল লাগল না। বললাম, 'সেরকম অনেক আশ্চর্য প্রাচীন জিনিসও ত এখনো মানুষের অগোচরে মাটির নীচে লুকিয়ে আছে। ধরে নাও, আজকের ঘটনাটা ঘটেইনি।'

'অসম্ভব!' গোল্ডস্টাইন গর্জন করে উঠল। 'লোকটা যে চোর সে বিষয় ত কোন সন্দেহ নেই। পাথরটাও ত ও চুরিই করেছিল। ও বাক্সর উপর ওর কোন অধিকার নেই। ওটা আমার চাই। ওটা আমি আদায় করে ছাড়ব—তাতে যত টাকা লাগে লাগুক। টাকার আমার অভাব নেই।'

আমরা কোনরকম প্রতিবাদ করার আগেই গোল্ডস্টাইন ঝড়ের মত ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

পেত্রুচিও গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলল, ' ভুল করল…গোল্ডস্টাইন ভুল করল। ব্যাপারটা আমার মোটেই ভালো লাগছে না।'

কিছুক্ষণ পায়চারি করে পেত্রুচিও নিজের ঘরে চলে গেল। আমি যে ভাবে খাটের উপর বসেছিলাম, সেইভাবেই আরো অনেকক্ষণ বসে রইলাম। চার হাজার বছর আগের উরের মৃত সম্রাটের শবযাত্রার দৃশ্য তখনো চোখের সামনে ভাসছে। সুদূর অতীতেও মানুষের বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি যে কতদূর অগ্রসর হয়েছিল, সেটা আজ যেমনভাবে টের পেয়েছি, তেমন আর কোনদিন পাইনি।

বিকেলের দিকে পেত্রুচিও ফোন করে জানিয়েছে যে গোল্ডস্টাইন তখনো ফেরেনি। আধঘণ্টা আগে আমিও তার ঘরে একবার ফোন করেছিলাম—কোন উত্তর পাইনি। রাত হয়ে গেল। এখন আর কিছু করার উপায় নেই। কাল সকাল পর্যন্ত দেখি। জিগুরাতের দেবতা ইশতারের কথা মনে করে গোল্ডস্টাইনের জন্য রীতিমত ভয় হচ্ছে।

নভেম্বর ২৩

বাগদাদের আশ্চর্য অভিজ্ঞতার যে এমন অদ্ভুত পরিসমাপ্তি হবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি। অতিরিক্ত লোভের যে কী পরিণাম হতে পারে তার একটা ভাল নমুনা দেখা গেল! অবিশ্যি আমি না থাকলে আরো বেশি বিপর্যই ঘটতে পারত সেটা ভেবেই যা সামান্য একটু সান্ত্বনা।

আজ ভোরে উঠেই টেলিফোন করে জানতে পারলাম যে গোল্ডস্টাইন রাত্রে হোটেলে ফেরেনি। খবরটা পেয়ে তৎক্ষণাৎ পেত্রুচিওর সঙ্গে যোগাযোগ করে স্থির করলাম যে আমাদের একটা কিছু করতে হবে। দুজনেই বুঝেছিলাম যে আমাদের আবার গুহাতেই ফিরে যেতে হবে। অল্ হাব্বাল্ সেখানেই গেছে, আর গোল্ডস্টাইনও নির্ঘাৎ তাকে ধাওয়া করতেই বেরিয়েছিল।

হোটেলের ম্যানেজার মিঃ ফারুকিকে বেড়াতে যাবার কথা বলতেই তিনি একটা গাড়ির বন্দোবস্ত করে দিলেন। ঠিক সাড়ে ছটার সময় আমি আর পেত্রুচিও গুহা অভিমুখে যাত্রা করলাম।

৭০ মাইল পথ যেতে ঘণ্টা দেড়েক সময় লাগল। যেখানে গতবার অল্ হাব্বাল্ গাড়ি থামিয়েছিল, এবারও সেখানেই আমার ড্রাইভারকে গাড়িতে অপেক্ষা করতে বলে আমি আর পেত্রুচিও গুহার দিকে রওনা হলাম।

গুহায় পৌঁছে দেখি ফটক বন্ধ। আমি এটাই আশা করেছিলাম, কিন্তু পেত্রুচিওকে দেখে মনে হল সে যেন মুসড়ে পড়েছে। বলল বৃথাই আসা হল। বোধহয় ডাইনামাইট দিয়ে ভেঙ্গে ফটক খোলা ছাড়া আর কোন রাস্তা নেই।,

আমি বললাম, 'তার আগে আমার স্মরণশক্তিটা একবার পরীক্ষা করে দেখতে চাই।'

পেত্রুচিও অবাক হয়ে বলল, 'তুমি বলতে চাও অল্ হাব্বাল্-এর সুর তুমি হুবহু নকল করতে পারবে?'

উত্তরে আমি আমার হাত দুটোকে মুখের সমনে চোঙার মত করে ধরে আমার গলাটাকে আমার স্বাভাবিক পর্দার চেয়ে রেশ কয়েক ধাপ উপরে তুলে বলে উঠলাম, 'চিচিং ফাঁক্ !'

কয়েক মুহূর্ত কিছু হলনা। তারপর গম্ভীর মেঘের গর্জনের মত একটা শব্দ শুরু হল। আমার পাশেই একটা টিকৃটিকি ভয় পেয়ে লেজ তুলে ঘাসের উপর দিয়ে সড় গড় করে পালাল। দেখলাম, গুহাব ফটকটা আস্তে আস্তে খুলে গিয়ে পিছনের হাঁ করা অন্ধকার দেখা যাচ্ছে।

খোলা শেষ হলে আমরা দুজনে দুরু দুরু বুকে গুহার ভিতরে প্রবেশ করলাম।

আমাদের দুজনের সঙ্গে টর্চ ছিল। আলো জ্বালতেই প্রথমে দুপাশে তাকের উপর জিনিসপত্রের গায়ে রং বেরঙের পাথরের চকমকানি ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না। তারপর মাঝখানে যে পাথরের উপর বাক্সটা রাখা ছিল, সেখানে টর্চ ফেলে দেখি জায়গাটা খালি। বাক্সের কোনি চিহ্ন মাত্র নেই।

পেত্রুচিও ইতিমধ্যে কোনের দিকটায় এগিয়ে গিয়েছিল ; হঠাৎ তার অস্ফুট চীৎকার পেয়ে আমিও সেইদিকে ধাওয়া করে গেলাম।

পেত্রুচিওর টর্চের আলো মাটির উপর ফেলা। সেই মাটির উপর চিৎ হয়ে চোখ চাওয়া অবস্থায় পড়ে আছে গোল্ডস্টাইন !

এবার আমার চর্চের আলো ফেলতেই গুহার কোনের সমস্তটা আলোয় ভরে গেল। তার আগে যে দৃশ্য দেখলাম তাতে রক্ত হিম হয়ে ভাসে।

গোল্ডস্টাইনের হাত তিনেক পিছনে পড়ে আছে অল্ হাব্বাল ; সেও চিৎ হয়ে শোয়া তার বুকের উপর দুহাত দিয়ে জাপটে ধরা চার হাজার বছরের পুরোন বায়স্কোপের বাক্স ; আর তার ঠিক পাশে পড়ে আছে গেমাল নিশাহিরের কঙ্কাল—যেমন ভাবে আগে দেখে গেছি, ঠিক তেমনি ভাবেই।

গোল্ডস্টাইনের নাড়ী পরীক্ষা করে হাঁপ ছাড়লাম। সে এখনো মরেনি—তবে তার অবস্থা সঙ্গীন—এক্ষুনি তাকে গুহার ভেতর থেকে বার করে নিয়ে তার চিকিৎসা করতে হবে।

অর আল্ হাব্বাল্ ? তার জীবন শেষ হয়ে গেছে। সম্ভবতঃ কাল থেকেই সে মৃত—কারণ বাক্সটা তার হাত থেকে ছাড়াতে গিয়ে দেখলাম সেটা আলগা করার কোন উপায় সেই—তার অসাড় হাত দুটো চিরকালের মত বাক্সটাকে বন্দী করে ফেলেছে।

* * * *

গোল্ডস্টাইনকে হোটেলে ফিরিয়ে এনেছি এই ঘণ্টাখানেক হল। তার জ্ঞান হয়েছে। ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করে বলেছে তার মধ্যে শারীরিক কোন গণ্ডগোল নেই। কিন্তু আমরা জানি যে তার মধ্যে একটা বিশেষ রকম কোন পরিবর্তন ঘটে গেছে—কারণ তাকে কালকের ঘটনার কথা জিজ্ঞেস করতেই সে একগাল হেসে বলল—'চিচিং ফাঁক !'

তারপর থেকে এই কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত তাকে যত প্রশ্নই করা হয়েছে—সবকটারই উত্তরে সে ওই এক ভাবেই হেসে বলেছে—'চিচিং ফাঁক !'

(১) নিশীথ, নীতীশ, সমীর ও মিতালী গুহ ১৬০০ বয়স ১৩, ১২, ১০, ৬½ বোনের নাম ভুল করে বাদ পড়ে গিয়েছিল, ভাই, বেশী রেগো না! মাঝে বেশ কিছুদিন ধরে ছাপাখানায় ধর্মঘট চলেছিল, জান বোধ হয়? তাই ছাপতে দেরি হচ্ছিল। ধাঁধার ফর্দে নাম ওঠেনি শুনে দুঃখিত, নিশ্চয় ডাকের গোলমালে দেরি হয়ে গিয়েছিল। তোমাদের আবীর পেয়ে খুসি হলাম।

(২) অন্তরা, ফুল্লরা সেন, ১৯২, বয়স ১৭ ও ১৪

সব উত্তর খুব ভালো হয়েছে। কিন্তু ভাই, অন্তরাকে এই হল শেষ চিঠি, কারণ ১৭ হয়ে গেলে গ্রাহক থাকতে পারে, তবে কোনো প্রতিযোগিতা চিঠিপত্র ইত্যাদি আসরে যোগ দিতে পারে না।

(৩) ভারতী বসু, ৩৯৭, বয়স ১৫

ছবির প্রতিযোগিতা মাঝে মাঝে হয় বইকি। তাছাড়া হাতপাকাবার আসরেও ছাপা হয়। ভাই, ডাকে বই হারালে আমাদের করণীয় কিছু থাকে না, কারণ under certificate of posting. পাঠান হয় ওঁদের আমরা জানাই, সব-ই করি। যাদের বই হারায় তারা ডাকবিভাগে চিঠি দিলে অনেক সময়ই চুরি কমে। তোমাব কথায় মনে হচ্ছে ডাকে হারানোর জন্যে তুমি আমাদের দায়ী করছ। তখুনি জানালে আরেক কপি পাঠানো হয়। না ভেবে-চিন্তে কাউকে দোষী না করাই ভালো নয় কি?

(৪) উত্তমকুমার বটব্যাল, ১৪৮১, বয়স ১২

ঐ তো মার্চ মাসে তোমার ভ্রমণকাহিনী বেরিয়েছে। অন্য লেখা মনোনীত হলে কাগজেই দেখবে। এ বিষয়ে সকলের সঙ্গে কথা বলতে গেলে যে সময় বা জায়গায় কুলোবে না।

(৫) শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী ২৮৪৪, বয়স ১১

পত্রবন্ধু চাই। শখ :—ছবি আঁকা, বইপড়া, কবিতা লেখা। ডাকটিকিট সংগ্রহ।

(৬) অভিজিৎ চৌধুরী, ১৯০২, বয়স ১৩

শুধু ভারতীয়রা মাতৃভুমি বলবে কেন, ইংরেজরাও তো mother land বলে। মাতে বাবাতে কি তফাৎ? ভগবানকেও তো কেউ মাতৃরূপে কেউ পিতৃরূপে চিন্তা করে।

(৭) পূরবী চক্রবর্তী ৩৪০, বয়স ১৫

ছাপাখানার ধর্মঘটের জন্যে সব দেরি হয়ে গেল, ভাই। পুরণো সন্দেশ কিনতে হলে আমাদের আপিসে এসে কেনাই ভালো। কি আছে না আছে দেখতেও পাবে ; তাছাড়া পার্সেল পোস্টই বল বা রেজিস্টার করে বুক পোস্ট্ই বল, অনেক খরচ পড়ে যায়।

(৮) দেবাশিস দত্ত, ২০৯৩, বয়স ১৩½।

অরু-মিতু আর ব্রাণ্টালুসি দুই-ই ভালো লেগেছে শুনে খুসি হলাম। এখন থেকেই যদি ভালো লেখার আদর শেখ, পরে দেখবে কত সুবিধা হচ্ছে।

(৯) অতুল্যকণ্ঠ নিয়োগী, ১৫০৯, বয়স ১০

পত্রবন্ধু চাই। শখ :—ডাকটিকিট জমানো, বইপড়া, খেলা।

(১০) নন্দিনী দত্ত মজুমদার, ১২৩২, বয়স ১৬

তাই কখনো হয়! যেখানে গল্প শেষ হয়, সেখানেই তো সব চরিত্রদের জীবন শেষ হয় না। শেষ কথা তা হলে কি করে লেখা যায় বল ?

(১১) অভিজিৎ দত্ত, ৪০০, বয়স ১২

এতদিনে কাগজ পেয়ে গেছ নিশ্চয়। দেরির কারণটা শুনলেই তো।

পত্রবন্ধু চাই। শখ :—খেলাধুলা, বইপড়া, খেলোয়াড়দের ছবি সংগ্রহ করা, গান বাজনা।

আশা করি ছবিগুলি একটা স্ক্র্যাপ—বুকে এঁটে, ছোট করে খেলোয়াড়ের বিবরণী লিখে রাখ।

(১২) সুস্মিতা সেনগুপ্ত, ১৩৭০, বয়স ১৩ বছর।

পত্রবন্ধু চাই—শখ :—ছবি আঁকা, গল্পের বই পড়া, জীবজন্তু পোষা ও তাদের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করা।

॥ মধ্যাহ্নে ॥

অশোক চক্রবর্তী

একটা কিছু লিখতে হবে—
আবহাওয়াটা যোগ্য।
একটা কিছু লিখলে এখন
হবেই উপভোগ্য।

কাব্য-ভরা গন্ধ বড়ো
স্পর্শ বোলায় অঙ্গে ;
হায় না-জানি চলতো লেখা
কতো কী এই সঙ্গে।

কিন্তু কিছু পাইনা ভেবে—
বিষম গোলোযোগ গো···
আবহাওয়াটা ছিল রে হায়
বড়োই লেখার যোগ্য।

বেবী কোথায়?

পুণ্যলতা চক্রবর্তী

ছোট্টদের জন্য ছোট্ট গল্প

পাশাপাশি দুই বাড়ি। এ বাড়ির বেবী আর ও বাড়ির বেলা দুজনে খুব ভাব।

রোজ সকালে বেবী বেলাদিদির বাড়িতে খেলতে যায়। বেলার অনেক পুতুল, আর মস্ত একটা পুতুল-বাড়ি। দশটা বাজলে বেলা স্কুলে চলে যায়, বেবীও বাড়ি ফিরে আসে।

বেলার সুন্দর একটা নতুন পুতুল এসেছে, চোখ বোজে, চোখ খোলে আবার 'মা' বলতে পারে! সময় হলে, বেলা স্কুলে গেল। বেবীও বাড়ি রওনা হল।

অনেক পরে বেবীদের ঝি তাকে ডাকতে এল। বেলাদের আয়া বলল—'বেবী ত কখ···ন চলে গেছে!'

বেবী বাড়িতে যায়নি, বেলাদের বাড়িতেও নাই, তাহলে সে কোথায় গেল? রাস্তায় চলে গেল না ত? বাড়ির পিছনে পুকুর, বাগানে কুয়ো আছে। পড়ে গেল না ত? বেবীর বাবা-মা ব্যস্ত হয়ে খুঁজতে বেরোলেন, দু বাড়ির লোক মিলে কত খোঁজাখুঁজি, ডাকাডাকি, বেবী কোথাও নাই! মায়ের চোখ দিয়ে জল পড়ছে বাবার মুখ শুকিয়ে গেছে, সকলের ভীষণ মন খারাপ!

হঠাৎ আয়া চেঁচিয়ে উঠল—'এই যে, বেবী এইখানে! পুতুল—ঘরটার ভিতরে ঢুকে গিয়ে, নতুন পুতুলটাকে বুকে নিয়ে বেবী গুটি সুটি হয়ে ঘুমিয়ে আছে! বাড়ি যেতে যেতে কখন যে-সে পুতুলের লোভে ফিরে এসেছিল কেউ জানে না!

মা ছুটে গিয়ে বেবীকে কোলে নিলেন, মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বেবী বলল—'ওমা'! আমাকে জন্মদিনে এমনি একটা পুতুল কিনে দেবে মা?'

সেই রাজা

তপনকুমার চৌধুরী

রাজ্য মোটে নেইকোযে তার
মন্ত্রী ও কি আছে?
নেইকো কোটাল বরকন্দাজ
ছত্রধারী কাছে।

ঝলমলানো রাজবাড়ি নেই,
নেইকো কিছুই হায়—
যায়না তো ঘুম ঝালর দেয়া
ফুলের বিছানায়।

নেইযে মাথায় রত্ন মুকুট
গলায় হীরের হার
তবুও সেতো মস্ত রাজা
নিজেই নিজে তার।

সেই রাজা সে খোকন সোনা—
রাজার পোষাক প'রে
সাজ ঘরেতে বুক ফুলিয়ে
রাজার মতই ঘোরে॥